সাধু হও সাবধান

জন্মসিদ্ধ ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজের
বেদতত্ত্ব আলোচনা ও ভাষণ সংকলন।।

অভিনব দর্শন

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

সমগ্র পরিকল্পনা, সংকলক, সংগ্রাহক ও প্রকাশক ঃ-
শ্রী চপল মিত্র

সংকলনে সহযোগিতায় ঃ-
ডঃ সুজাতা গঙ্গোপাধ্যায় ও হেনা মিত্র

প্রথম প্রকাশ ঃ-
১লা আশ্বিন, ১৪১৬ ১৮ই সেপ্টেম্বর, ২০০৯

মুদ্রণ -- মেসার্স এম. দত্ত
১১, ওল্ড পোষ্ট অফিস ষ্ট্রীট কোলকাতা - ৭০০০০১

চিঠিপত্র ও বই সংক্রান্ত অন্যান্য বিষয় যোগাযোগ ঃ-
''অভিনব দর্শন''
স্বপ্ননীড় অ্যাপার্টমেন্ট, ৪নং পল্লীশ্রী, ২৯১ এস. কে. দেব রোড
পোঃ- শ্রীভূমি, পি.এস.- লেকটাউন, কোলকাতা-৪৮, ফোন - ২৫২১-৫১৯৬
মোবাইল - ৯২৩১৮-৯২০৮৫, ৯৪৩২৩-৭২০৭২
Email : bbt_sukchar@yahoo.co.in

Website : www.avinabadarshan.com

প্রাপ্তিস্থান ঃ-
১) ব্রহ্মচারী ধাম সুখচর, উত্তর ২৪ পরগণা, কোলকাতা - ৭০০১১৫
২) ১৯৭, লেক টাউন, ব্লক-বি, কোলকাতা-৮৯, ফোন - ২৫২১-৫১৪৬
৩) ২৯১ এস. কে. দেব রোড শ্রীভূমি, পি.এস.- লেকটাউন, কোলকাতা-৪৮, ফোন - ২৫২১-৫১৯৬

সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত।

পূর্বাভাষ

মহাসৃষ্টির বিরাট সুরে ভরপুর হয়ে প্রতিটি জীবের জন্ম। জন্মের সাথে সাথে সৃষ্টিতত্ত্বের যে মহাদান, তা প্রতিটি মানুষ, প্রতিটি জীব বহন করে নিয়ে এসেছে নিজ নিজ দেহযন্ত্রের মাধ্যমে। ইচ্ছাকৃতভাবে খামখেয়ালির বশে প্রকৃতির এই অমূল্য মহাদান, জীবনকে নষ্ট করার জন্য মানুষের জন্ম হয়নি। কিন্তু এই অনন্ত জীবন যাত্রার পথে চলতে গিয়ে অনেক বাধা বিঘ্ন, নানা সমস্যা ও জটিলতার মধ্যে জীবকে পড়তে হয়। সমাজ সংসারের কাছে নতি স্বীকার করে, আমরা অনেক সময় বিবিধ পাপকার্যে জড়িয়ে পড়ি। ফলে অন্তরজগতে ও বর্হিজীবনে নানা পাপকার্যে লিপ্ত হই। সেই সময়ে আর কোন্‌টা ন্যায়, কোন্‌টা অন্যায় বিচার করি না। যদিও প্রতিটি জীবের অন্তরে প্রকৃতির মহাদান বিবেক সদা জাগ্রতরূপে বিরাজমান। এই বিবেকই অতন্দ্র প্রহরীর মতো ন্যায় অন্যায়, পাপ পুণ্য বোধ সম্পর্কে জীবকে সবসময় সচেতন করে দিচ্ছে। কিন্তু এমনই অবস্থা সংসারের চাপে, সমাজের চাপে, লোভ, যশ, মোহ, নেতৃত্বের চাপে আমাদের বিবেকও আজ চাপা পড়ে যাচ্ছে অপরাধের স্তূপের বধ্যভূমিতে। এর ফল স্বরূপ প্রকৃতির কঠোর আইনের ঘরে রেহাই আমরা কেউ পাব না।

আমাদের এই স্বল্পায়ু জীবনে সব কিছুই টেম্পোরারি। আমরা বেঁচে আছি টেম্পোরারি। আমাদের বিষয় সম্পত্তি, ভোগ বিলাস, জায়গা জমি, বাড়ী, গাড়ী সবই টেম্পোরারি। এই টেম্পোরারি বা ক্ষণস্থায়ী জীবনে আমরা আশার বাসা বাঁধতে চাইছি। তারজন্য কোন অন্যায় অপরাধ, ত্রুটি বিচ্যুতি করতে দ্বিধাবোধ করছি না। আর সংসারের মায়াজালে, যশ, লোভ, অহঙ্কারের জালে যতই আবদ্ধ হচ্ছি, ততই ত্রুটি বিচ্যুতি, অপরাধের মধ্যে আরও জড়িয়ে পড়ছি। এর পরিণাম স্বরূপ জ্বালা, যন্ত্রণা, হতাশা নিরাশার মধ্য দিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, কোটি কোটি বছরের অপরাধগুলোর সাথে আরও অপরাধ যুক্ত করে আমরা অন্ধকারের অতল তলে তলিয়ে যাচ্ছি।

প্রকৃতি তাঁর এই মহাদান কেন জীবকে দিলেন তার দেহবীণাযন্ত্রে? এই সমাজ সংসারের মধ্যে থেকেই কোটি কোটি বছরের সঞ্চিত অপরাধগুলো থেকে আমরা কিভাবে মুক্ত হতে পারি? আমাদের এই মুক্তির জন্য চাই পাথেয়। তাই প্রত্যেককে পাথেয় গুছিয়ে নিতে হবে। কিন্তু বাস্তবে দৈনন্দিন জীবনে আমরা কি গুছাচ্ছি? জেনেশুনে প্রতি মুহূর্তে আমরা অন্যায় অপরাধ করে যাচ্ছি। এইগুলিই রাহুর মতো গ্রাস করে আমাদের একেবারে শেষ করে দিচ্ছে। মৃত্যুর পর এইগুলিই আমাদের পাথেয় হবে, সাথের সাথী হবে। তারই পরিণাম স্বরূপ এক একবার বিভিন্নরূপে জন্মাব আর মরবো।

সাময়িক প্রশংসা অর্জনের জন্য, যশ, মান প্রতিষ্ঠার জন্য মানুষ আজ কি না করছে? এক একজনের অপরাধ পাহাড় সমতুল্য হয়ে গেছে। এই অপরাধের স্তূপে আজ আমাদের চলার পথ এমন কুয়াশাচ্ছন্ন যে, একটু অন্যমনস্ক হলেই পিছলেয়ে একেবারে অন্ধকার খাদের নীচে চলে যেতে হবে। তাই এখনই আমাদের সাবধান হতে হবে। এই কুয়াশাচ্ছন্ন অবস্থা থেকে আলোর দিশায় আসতেই হবে। নাহলে জীবকে বারংবার জন্ম মৃত্যুর চক্রে আবর্ত্তিত হতে হবে। তাই এই চক্র থেকে মুক্তি একমাত্র উপায় জন্মসিদ্ধ মহানের আর্শীবাদ, ভালবাসা ও কৃপা। তাঁর প্রাণের স্পর্শ ছাড়া অন্য কিছুতেই সেটা সম্ভব নয়। একমাত্র তিনিই পারেন তাঁর প্রাণের স্পর্শে কোটি কোটি জন্মের অপরাধের স্তূপের বধ্যভূমি থেকে জীবকে মুক্ত করতে।

অন্যায় অপরাধের ভয়ঙ্কর পরিণাম সম্পর্কে মানুষকে সাবধান করার উদ্দেশ্যে জন্মসিদ্ধ মহান ঠাকুর শ্রীশ্রীবালক ব্রহ্মচারী মহারাজ কখনও ঘরোয়া পরিবেশে, কখনও বিভিন্ন জনসভায় ও বেদের সভায় অমৃতময় বেদতত্ত্ব ও সাবধান বাণী পরিবেশন করেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ও নির্দেশমতো তাঁর এই অমৃতময় বেদতত্ত্ব ছোট ছোট পুস্তিকা আকারে প্রকাশের গুরুদায়িত্ব তাঁরই প্রতিষ্ঠিত **'অভিনব দর্শন'** প্রকাশনের উপর তিনি অর্পণ করেছেন। শ্রীশ্রীঠাকুরের ইচ্ছা ও নির্দেশের প্রতি পূর্ণ মর্যাদা জানিয়ে তাঁর নির্দেশকে শিরোধার্য করে **'অভিনব দর্শন'** প্রকাশনের ২৬তম শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রকাশিত হল, **'সাধু হও সাবধান।'**

পরিশেষে জানাই, যে সকল ভক্ত ও গুরুগতপ্রাণ ভাইবোন আন্তরিকতার সাথে এই অমৃতময় বেদতত্ত্বের গভীরতা ও মাধুর্য আস্বাদন করার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করছেন, তাদের সকলকে জানাই পরম পবিত্র বৈদিক অভিনন্দন **রাম নারায়ণ রাম**।

শুভ মহালয়া, ১৪১৬ — *চপল মিত্র*

ইং ১৮ই সেপ্টেম্বর, ২০০৯ — *(সংকলক, সংগ্রাহক ও প্রকাশক)*

জেনে শুনে প্রতি মুহূর্ত্তে আমরা অপরাধ করে যাচ্ছি

১৯শে মে, ১৯৮২
সুখচর ধাম

জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত প্রতিদিন প্রতিনিয়ত আমরা যেসব ভুল করে চলেছি, তার সংশোধন আমাদের হাতেই রয়েছে। প্রতিটি ভুলের অন্তর্নিহিত কারণ আমরা চিন্তা করলে বুঝে নিতে পারি। তবু আমরা ভুল করে যাচ্ছি। প্রতিটি মানুষ ভুল করছে দুই প্রকারে, কখনও জ্ঞাত-সারে, কখনও অজ্ঞাতসারে। জ্ঞাতসারে যে ভুল, সেটিই হল ত্রুটিমূলক, সেটিই অধিকতর অপরাধের পর্যায়ে পড়ে যাচ্ছে। জেনে শুনে প্রতিমুহূর্ত্তে আমরা অপরাধ করে যাচ্ছি। কি কি কারণে বা কোন্ কোন্ কারণ উদ্ভুত হলে ত্রুটিগুলো করা হয়, সেটি জেনে নিয়ে একটু চেষ্টা করলেই ত্রুটিমুক্ত হওয়া যায়, মনের দিক থেকে ভালভাবে থাকা যায়। **ভুল করে, ত্রুটি বা অপরাধ করে যতই ভাল সাজ না কেন, মনের দিক থেকে তৃপ্তির অভাব থাকবেই।** আবার যতই গালিগালাজ করুক, রাগ বা মেজাজ করুক, নানা দোষে তোমার প্রতি দোষারোপ করুক, যদি জান ভুল করিনি, অযথা ভুল ধারণা করা হয়েছে তোমার প্রতি, তাহলে একদিকে থাকবে তৃপ্তি, 'আমি তো ভুল করিনি, অন্যায় করিনি।' অপরদিকে দুঃখও থাকবে, 'অযথা আমাকে দোষারোপ করলো।' না জেনে না শুনে ভুল করে দোষারোপ করলো যারা, অন্যায় হল তাদের। আইনের ঘরে তারা রেহাই পাবে না। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে এটাই হয় বেশী। ভুল বোঝাবুঝি আর অন্যায় দোষারোপ সেভাবেই হয়।

কান কথা শুনবে কিন্তু কান কথার ওপরে নির্ভর করে চলবে না। কারণ যে কথাগুলি বলছে, তার ব্যক্তিগত আক্রোশ থাকতে পারে। ভুল বুঝিয়ে ভুল দোষারোপ করে, তার বিরুদ্ধে তোমাকে ভুল চিন্তা করানোই হয়তো তার উদ্দেশ্য। এই জন্যও অনেকে কানভারী করার চেষ্টা করে। তাই প্রমাণ না পাওয়া অবধি কোন কথাই বিশ্বাস করবে না। সেখান

থেকে সরে যাবে। না হলে বলবে, 'সবই শুনলাম। কিন্তু সঠিকভাবে না জানা পর্যন্ত কোন সিদ্ধান্ত নিতে পারছি না।' আমাদের দেশে এটা চলছে খুব বেশী। এ ওর বিরুদ্ধে বলছে, ও এর বিরুদ্ধে বলছে। এইভাবেই রেষারেষিটা চলছে। মনে কর, একজনের বিরুদ্ধে তোমার রাগ আছে। আর একজন এসে তার বিরুদ্ধে তোমাকে বলতে শুরু করলো। তোমার মনোমত কথা বলাতে তুমিও মনোযোগ সহকারে শুনতে শুরু করলে। হয়তো তোমাকে হাত করার জন্য বেশীরভাগ কথাই সে বানিয়ে বানিয়ে বলেছে। সেক্ষেত্রে ভাববে, সে যতবড় শত্রুই হোক না কেন, তার বিরুদ্ধে যে কথাগুলো বলছে, সঠিক কি না জান না। সুতরাং তাতে সায় দেবে না। অনেকে আছে, নিন্দা চর্চা সমালোচনা— একবার শুরু করলে আর থামতে চায় না। 'ক' এই কথা বলেছে, 'খ' এই এই করেছে, 'গ' এই কথা বলেছে, এইভাবে তোমাকে তাতাতে শুরু করেছে। তুমি চিন্তা করবে, 'ক, খ, গ যাই বলুক, **সত্যতা সম্পর্কে না জানা অবধি আমি কোন মন্তব্য করবো না।' সুতরাং তুমি কোন কথাতেই সায় দেবে না। নিন্দা, চর্চা মুখরোচক জিনিস। বলতে কইতে নেশার মত ভালই লাগে। তুমি তাতে কর্ণপাত করবে না, জড়িয়ে যাবে না। আগে দেখে নেবে, জেনে নেবে, কথাগুলো ঠিক কি না। লক্ষ লক্ষ সংসার এইভাবে ভেঙে যাচ্ছে।** ঘরের ভিতর বৌর সাথে শাশুড়ী, ননদের, এক জায়ের সাথে আরেক জায়ের— প্রায় সংসারে একটা না একটা অশান্তি লেগেই থাকে। অনেক শাশুড়ী বৌয়ের সম্বন্ধে ছেলের কাছে নানা কটূক্তি করে, 'বৌ ভাল নয়, তার ব্যবহার সুন্দর নয়,' ইত্যাদি। এসব কথায় মনোনিবেশ করবে না। প্রতি মুহূর্তে ভাববে, জীবনের সময় সীমা খুবই অল্প। না জেনে না শুনে ধারণা করে অযথা দোষারোপ করা অপরাধ। এমন কোন কথা বলবে না, যাতে অপরে আঘাত পেতে পারে।

মনে কর, তোমার বিরুদ্ধে কেউ কিছু বলেছে, সেটি তোমার কানে এসেছে। তুমি তাকে সরাসরি জিজ্ঞাসা করবে। যদি সে বলে, 'বলি নাই', সত্য কথা বললে বেঁচে গেল। এ নিয়ে আর মাথা ঘামাতে যাবে না। যদি মিথ্যা বলে, সে অপরাধে ডুবে গেল। তোমার তাতে কোন দোষ হবে না।

তুমি সারাদিন সংসারে অনেক কাজ করছো। কিন্তু 'ক' বলছে 'খ'-এর কাছে, 'গ' ফাঁকি দেয়, বেশী কাজ করে না। তুমি শুনলে 'ক' তোমার বিরুদ্ধে বলেছে, 'খ'-এর কাছে। তুমি 'খ'-কে জিজ্ঞাসা করলে, 'ক' তোমার সম্বন্ধে কি বলেছে?

'খ' সত্য কথাই বললো। 'ক' বলেছে 'গ' সংসারে কাজ মোটেই করে না। ফাঁকি দিয়ে দিয়ে চলে।

তুমি আবার 'ক' কে জিজ্ঞাসা করলে, তুমি আমার সম্বন্ধে এই কথা বলেছ?

—'ক' যদি সত্য কথা বলে, তাহলে বলবে,

—হ্যাঁ বলেছি।

—কার কাছে বলেছ?

—খ-এর কাছে।

—কেন বলেছ? তোমার জিজ্ঞাসার উত্তরে সে বললো, 'আমার তখন মেজাজ ভাল ছিল না। আমি রাগ করে বলেছি।' সত্য কথা বলাতে তার অপরাধ কিছু বাঁচলো। কিন্তু না জেনে অপরের নামে দোষারোপ করায় সে আটকে গেল। যদি 'ক' অনুতপ্ত হয়ে তোমার কাছে ক্ষমা চায়, 'আমি অন্যায় করেছি আর করবো না' এবং তুমি যদি তাকে ক্ষমা করো, তাহলে ১৫ আনা বাঁচলো। কিন্তু একটু থেকে যাবেই।

কোন কাজে অযথা সন্দেহ করবে না। সংসারে শতকরা ৮০, ৮৫ এমনকি ৯০ ভাগ পর্যন্ত মানুষ ভোগে সন্দেহের রোগে। এর ফলে কত ঘর সংসারে অশান্তির আগুন লেগে গেছে, কতজন suicide করেছে, কত মানুষ পাগল হয়ে গেছে। তোমরা না জেনে, না বুঝে কাউকে সন্দেহ করবে না। এই সন্দেহ ব্যাপারটি এমন একটি ব্যাধি, যাতে একবার আক্রান্ত হলে ছাড়ানো বড় মুস্কিল। মনে কর, 'ক' 'খ'-কে সন্দেহ করছে। 'খ' কি করছে নজর দিচ্ছে, কোথায় যাচ্ছে লোক পাঠাচ্ছে। কোন কিছুতেই স্বস্তি নেই, কোন কাজে মন বসে না। সদাই দুশ্চিন্তা, 'খ' এখন কি করছে? 'ঐ বুঝি কার কাছে গেল, কার সাথে প্রেম করলো' ইত্যাদি। আর বাড়ীতে এলেই ক খ-এর সাথে খটাখটি শুরু

করছে। 'খ' যে সন্দেহমূলক কাজ না করছে, তা নয়। তাকে কাজকর্ম, চাকরী, ব্যবসা ইত্যাদি নানা কারণে বাইরে যেতে হচ্ছে। কিছু কিছু গুছাতে পারলে হয়তো কাজ উদ্ধার করার সহায়তা হয়, তাই 'ক' কে না বলেই সে অনেক কাজ করছে। 'ক' জিজ্ঞাসা করলে এড়িয়ে এড়িয়ে যায়। বলে না। এতে 'খ'-এর ত্রুটি হয়ে যাচ্ছে। 'খ' যদি ভুল করে তার খেসারত সে দেবে, উপায় নাই। 'ক' তখন কি করবে? সে কি অশান্তিতে ভুগতেই থাকবে? না। 'ক' মনে করবে, 'যে যা খুশী করুক না কেন, আমি আমার কাজ করে যাব।' অনেকের আবার আরেক রকমের ব্যাধি আছে। 'ক' 'খ' কথা বলছে, 'গ' মনে করছে, আমার সম্বন্ধে বলছে। মনে করলে চলবে না। জিজ্ঞাসা করে নিতে হবে। 'ক' ও 'খ'-কে জিজ্ঞাসা করলে যদি সত্য কথা বলে ভাল। আর মিথ্যা বললেই গেল। যে কোন কথাই মিথ্যা বললে অপরাধে পড়ে যাবে।

বেশীরভাগ ক্ষেত্রে গোলমাল হয়, ভালবাসতে গিয়ে। মনে কর 'ক' ভালবাসে বাইরের 'গ' কে। সে বাড়ীতে মাকে লুকায়, বাবাকে লুকায়, বাড়ীর অন্যান্য লোকজনদের কাছেও মিথ্যা বলে লুকাতে শুরু করেছে। অপরাধ হয়ে যাচ্ছে। কারও সাথেই এমন ভালবাসা করবে না, যেটা অন্যের কাছে লুকাতে হয়, ছল চাতুরী, প্রবঞ্চনা করতে হয়, মিথ্যার আশ্রয় নিতে হয়। যদি কাউকে ভালবাসতে ইচ্ছে হয়, বাবা, মা ও অন্যান্য গুরুজনদের মত নেবে। তারা যদি অমত করেন, তাহলে যাবে না। জোর করে কখনও কাউকে ভালবাসবে না। কখনও পালিয়ে যাবে না। সর্বদা মনে রাখবে, তোমার আচরণে, ব্যবহারে কথায়, বার্ত্তায় কেউ যেন আঘাত না পায়।

অনেকে স্কুল, কলেজ ফাঁকি দিয়ে, ক্লাস পালিয়ে সিনেমা যায়। বাড়ীতে এসে মা বাবাকে মিথ্যা কথা বলে— অপরাধ হয়ে গেল। মা বাবা যে তার ফাঁকি ধরতে পারলেন না, সন্তানের প্রতিটি কথাই বিশ্বাস করলেন, তাদের সহজসরল মন নিয়ে ছিনিমিনি খেলার জন্য, আরও অপরাধের জালে জড়িয়ে পড়লো।

প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায় খুঁটিনাটি দেখতে গেলে বহু অপরাধ আছে। আমি কিছু কিছু জানিয়ে দিয়ে যাচ্ছি মাত্র।

খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে কোন কিছু লুকিয়ে খাবে না। বাইরে খেয়ে বাড়ীতে কখন লুকাবে না। বকুনি খাবে জেনেও, সব খুলে বলবে।

টাকা-পয়সা, অর্থকড়ি অনেকে না বলে নেয়, লুকিয়ে নেয়, চুরি করে, এটা অত্যন্ত খারাপ অভ্যাস। অনেক সময় এমন তো হয়, কোন জিনিস কেউ লুকিয়ে নিয়েছে, পাওয়া যাচ্ছে না। বাড়ীতে হুলুস্থুলু পড়ে গেছে। তন্ন তন্ন করে খোঁজাখুজি চলছে। যে নিয়েছে, সে হয়তো বিক্রী করে দিয়েছে। তাই কিছুতেই পাওয়া যাচ্ছে না। তখন শুরু হল জিজ্ঞাসা পর্ব। যে নেয়নি, সে তো অস্বীকার করবেই। সে সত্য কথাই বলছে। আর যে নিয়েছে, সেও অস্বীকার করছে। সে মিথ্যা কথা বলছে। তখন দোষ পড়লো বাড়ীর ঝি চাকরদের উপর। শুরু হল মারধোর, টানা হেঁচড়া। থানা, পুলিশ পর্যন্ত ব্যাপারটা গড়লো। মারাত্মক অপরাধ হয়ে গেল। এই একটি ব্যাপারকে কেন্দ্র করে অনেক অপরাধে পড়ে গেল। মা বাবার কাছে মিথ্যা বলার অপরাধ। ঝি চাকররা মার খেল, তাতে অপরাধ। উপায় নাই। প্রকৃতির মানদণ্ডে সাংঘাতিক বিচার হয়ে যাবে।

অনেককে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে সঠিক উত্তর দেয় না, চুপ করে থাকে। বারবার জিজ্ঞাসা করা হচ্ছে। কিন্তু সাড়া দিচ্ছে না, কিছু বলছে না, ত্রুটিমূলক। যিনি জিজ্ঞাসা করছেন, তিনি রাগ করুন বা খুশী হন, জিজ্ঞাসার সাথে সাথে উত্তর দেওয়াই বিধেয়।

অনেক স্ত্রী স্বামীকে সন্দেহ করে। আবার বহু স্বামী স্ত্রীকে সন্দেহ করে। স্বামী স্ত্রীতে সন্দেহ আসে, সন্দেহ থাকতে পারে। তার সমাধান করে নিতে হবে। উভয়েই যদি অন্যের প্রতি আসক্ত হয়ে পরস্পর পরস্পরের কাছে গোপন করে, তবে উভয়েরই অপরাধ হবে।

অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, স্ত্রী অত্যন্ত ভাল, সতীসাধ্বী, স্বামীগত প্রাণ। কিন্তু স্বামী যেন ততটা নয়। স্বামীর দেরী হয় বাড়ীতে ফিরতে। অনেক রাত্রিতে স্বামী বাড়ী ফিরলে স্ত্রী কান্নাকাটি করে, রাগ করে। তার সন্দেহ হয়, স্বামী বুঝি কারও সাথে দেখা করতে যায়। স্বামী বলছে, সে তার বন্ধুর কাছে যায়, সেখানে সবাই মিলে খেলে, তাই তার ফিরতে রাত হয়। স্ত্রী বিশ্বাস করে না। স্বামীর কথায় বিশ্বাস না করে বাড়তি কথা বললে স্ত্রীর অপরাধ। আর স্বামী যদি সত্য কথা বলে তো বেঁচে গেল।

কিন্তু সে যদি অন্যত্র যায়, আর খেলার নামে বেঁচে যাওয়ার চেষ্টা করে, তাহলে তার অপরাধ। যেখানে অন্তর্যামিত্ব নেই, কেউ কারও মনের কথা বোঝে না, যে দেশে অন্ধের মত পরস্পরের সাথে ঠোকাঠুকি চলেছে, সে দেশে ভুল বোঝাবুঝি থাকবেই। এরূপ ক্ষেত্রে প্রত্যেককে নিজের মনকে তৈরী করে নিতে হবে। স্ত্রী ভাববে, ''সংসারের প্রতি আমার যে কর্তব্য আমি সেই কর্ত্তব্য রক্ষা করে যাব। স্বামী যদি আমাকে ঠকায় চুলোয় যাবে, আর আমি যদি তাঁকে ঠকাই, শেষ হয়ে যাব।'' এই স্বল্পায়ু জীবনে এসব নিয়ে মাথা ঘামালে আসল কাজই তো ব্যর্থ হয়ে যাবে। যে প্রয়োজনে জন্মগ্রহণ করেছো এই ধরাধামে, সৃষ্টির সেই ব্যাপক, বিরাট উদ্দেশ্য সাধনের পথে কোন প্রয়াসই যে সফল হবে না। দৈনন্দিন জীবনে সাত পাঁচ ছয় তিন, নানা কথা নিয়ে সদাসর্বদা ব্যস্ত থাকতে হয়, ছেলেমেয়েদের ওপরে নজর রাখতে হয়, স্বশুর শাশুড়ীর সেবা করা, ঘর বাড়ীর নানা কাজ গুছান, কোনটিই বাদ দিলে চলে না। প্রত্যেকের কর্ত্তব্য নিজ নিজ কাজ করে যাওয়া। 'যে ভুগছে সন্দেহের ব্যারামে, তার তো সব শেষ।'

তোমরা সর্বদা সচেতন থাকবে, 'অযথা সন্দেহ করবো না, অযথা বাক্যালাপ করবো না। যেটুকু কথা বলবো, জিজ্ঞাসা করা ও জেনে নেওয়ার উদ্দেশ্যেই বলবো।' **আজকের এই সমস্যাবহুল জীবনে সন্দেহের এত কারণ চারিদিকে ছড়িয়ে আছে যে, জীবনের নানা অবস্থায় সন্দেহ আসবে, দ্বন্দ্ব আসবে, সেটাই স্বাভাবিক। এমন বহু ঘটনা ঘটছে চারিদিকে। যাই আসুক না কেন, তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে জেনে নিতে হবে।** তুমি নম্রভাবে জিজ্ঞাসা করবে, 'আমার মনে এই ব্যাপারে একটা সন্দেহ জাগছে, দ্বন্দ্ব আসছে— সেটা কি ঠিক?' এর উত্তরে সে তোমাকে যা বলবে, সেটাকেই সত্যি বলে মেনে নেবে। সে যদি সঠিক উত্তর দেয়, ত্রুটিমুক্ত হল, বাঁচলো। আর যদি তোমাকে মিথ্যা বলে বোঝাবার চেষ্টা করে, সে ডুবল।

আগেই বলেছি, অন্তর্যামিত্বহীন দেশে অন্ধের মত চলেছে সবাই। তুমি যদি কোন অন্ধ ব্যক্তিকে 'ভেচ্‌কি দাও, কাঁচকলা দেখাও,' সে তো দেখতে পাচ্ছে না। আরেকজন যদি তাকে বলে দেয়, 'তোমাকে ও

ভেচ্‌কি দিল, কাঁচকলা দেখাল।' এটা জানিয়ে দেওয়াতে অন্ধ ব্যক্তিটি মনে মনে অত্যন্ত আঘাত পেল, তোমার অপরাধ হয়ে গেল। অন্তর্যামিত্বহীনতা শ্রবণহীনতা ও দৃষ্টিহীনতার মত। মনে মনে কেউ যদি কাউকে মারতে চায়, আমরা তো জানছি না। কেউ না জানলেও মনে মনে কারও ক্ষতি করার প্রচেষ্টাই অপরাধ। সদা সতর্ক হয়ে চলবে, মনে মনেও যেন কারও প্রতি বিরুদ্ধভাব, বিদ্বেষভাব না থাকে। আমরা নীরবে নির্দোষ হয়ে, পবিত্র হয়ে থাকবো। চারপাশে অনেক শত্রু তো থাকে। একজন হয়তো এসে বললো, 'তোমার শত্রু তোমাকে রাস্তাঘাটে খুঁজছে, তুমি সাবধানে চলাফেরা ক'রো।' তুমি সাবধানে থাকবে, সতর্কতা অবলম্বন করবে তোমার প্রতি কাজে। কিন্তু সম্পূর্ণ বিশ্বাস করবে না। কারণ সে সত্যসত্যই তোমার হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে তোমাকে সাবধান করতে পারে, আবার ভয় দেখাবার জন্যও বলতে পারে। এক্ষেত্রেও তুমি তাকে জিজ্ঞাসা করে নেবে। যদি সত্যই তোমার পিছনে শত্রু ঘুরতে থাকে, তবে সেকথা জানিয়ে সে উত্তম কাজই করেছে। আর যদি বলে, 'একটু রগড় করার জন্য তোমাকে ভয় দেখিয়েছি।' তবে সত্য কথা বলায় কিছুটা রেহাই পেলেও ত্রুটি হয়ে গেল।

কোন মানুষের উপরে কখনও চাপ সৃষ্টি করবে না। অযথা কথা বলে ঝগড়ার সৃষ্টি করবে না। বেশীরভাগ ক্ষেত্রে এভাবেই কথা বেড়ে গিয়ে ত্রুটি বাড়তে থাকে। সর্বদা নীরব থাকতে চেষ্টা করবে। কখনও মনে মনে দুঃখকে পোষণ করবে না। বেশীরভাগক্ষেত্রেই ধারণা বশতঃ নানা চিন্তার ফলে দুঃখপোষণ হয়ে থাকে। ভুলবোঝাবুঝি আরেকদিকেও হয়। অনেকেই এই ভুল করে থাকে, 'সে যে আমাকেই ভালবাসে। আমাকে বলে আমি ছাড়া আর কেউ নেই তার জীবনে। তবে এমন কেন হয়? আবার কেন অনেকে আসে তার কাছে, সে কত কথা বলে তাদের সঙ্গে' — ধারণার বশে এসব চিন্তা, এসব ভাব কখনও মনে পোষণ করবে না। সে অনেকের সাথে কথা বলতে পারে, কিন্তু অন্য কাউকে তোমার চেয়ে বেশী ভালবাসে কি না, তাতো তুমি জান না। তোমাকে ভালবাসে, একথা জানলেই যথেষ্ট। যদি তোমাকে আঘাত দেয়, এড়িয়ে যায়, তার অপরাধ। তুমি দুঃখের বোঝা ঘাড়ে নিতে যাবে কেন? তুমি

সর্বদা আনন্দে থাকতে চেষ্টা করবে। বর্ত্তমান পরিস্থিতিতে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তো জটিল পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে থাকে। সুতরাং আনন্দে থাকা অনেকসময়ই সম্ভবপর হয় না। এক্ষেত্রে তুমি ভাববে, 'কতদিন বাঁচবো? সংসারের ক্ষেত্রে চালে ডালে মিশিয়ে একদিকে চাল, আর একদিকে ডাল বেছে চলেছি। কেন মিশালাম? আর বেছেই বা কি হবে? যে যা খুশী করুক, যা হবার হবে, আমি সৎভাবে থাকবো। **সময় তো বেশী নেই ৮০/৮৫-তেই জীবনের খেলা শেষ।' এই স্বল্প সময়ের মধ্যে সুচিন্তায়, আনন্দে, আত্মতৃপ্তিতে যতটা সময় থাকতে পারবে, ততক্ষণই তুমি ভরপুর হয়ে থাকবে।** সেই চেষ্টাই প্রত্যেকের করা উচিত।

মা বাবা বা অন্যান্য গুরুজন, যারা তোমাকে ভালবাসেন, স্নেহ করেন তাদের যেন বারবার করে তোমার রাগ ভাঙাবার জন্য চেষ্টা করতে না হয়। তুমি বাবা মা বা গুরুজনদের ভুল বুঝেছ। তোমার ধারণা তোমাকে তারা অবজ্ঞা করেছেন, তোমাকে আদর যত্ন করেন না, ইত্যাদি। **বাড়ীর লোকজনদের সম্পর্কে নানা ভুল চিন্তা করে, তুমি রাগ করে না খেয়ে আছ, বাড়ী থেকে বেড়িয়ে যাচ্ছ, আরও কত কি করছো। বাবা মা ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন তোমার জন্য। তোমাকে খাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করছেন। বাবা মা কাজ করে তোমার কাছে কৈফিয়ৎ দিচ্ছেন, তোমার অপরাধ।**

আগেই বলেছি, যে ধারণার বশবর্ত্তী হয়ে তুমি রাগ করলে, গুরুজনদের মনে ব্যথা দিলে, বাড়ীর বেশীরভাগ মানুষকে ব্যতিব্যস্ত করলে, তোমার ধারণাটি সঠিক কিনা জিজ্ঞাসা করে জেনে নিলেই সমাধান হয়ে যেত। যাকে জিজ্ঞাসা করলে, সে যদি নিজের ভুল স্বীকার করে বা সত্য কথা বলে, তবে বাঁচলো। আর স্বীকার না করলেই ডুবে গেল।

তুমি মনে মনে স্বচ্ছতায় ভরপুর হয়ে থাকবে। যে যে উদ্দেশ্য নিয়ে যে কোন কথা বলুক না কেন, তোমার তাতে কর্ণপাত করার প্রয়োজন নেই। তোমার জিজ্ঞাসার উত্তরে যে যা বলুক, তুমি বলবে 'ঠিক আছে'। এর চেয়ে বেশী আর কোন চিন্তা করবে না। **সাধনার দিক থেকে মনে রাখবে একটি কথা। যে সাধনা যখন করবে, গান কর,**

পড়াশুনা কর অথবা নাচ শেখ— যে শিক্ষাই কর না কেন, এমন কোন গাফিলতি মনে স্থান দেবে না, যাতে তোমার সাধনায় ব্যাঘাত জন্মায়। যত অশান্তিই আসুক, সাধনা যেন বন্ধ না হয়। তুমি তোমার কর্ত্তব্য করে যাবে। এই সংসারে যারা জন্ম গ্রহণ করেছে, তাদের আর ভাল লাগার কি আছে? এখানে সবই যে টেম্পোরারি। বেঁচে আছ টেম্পোরারি, বিষয় সম্পত্তি ভোগ করছো টেম্পোরারি, জায়গাজমি কিনছো, সবই টেম্পোরারি। সবই যেখানে টেম্পোরারি, সেখানে আশার বাসা কেন বাঁধতে চাইছো? আশার বাসা বাঁধা যায়, ঘরটি যদি চিরস্থায়ী হয়। জীবনটিই তো ক্ষণস্থায়ী, কেন তারজন্য ঘাঁটাঘাঁটি করছো? চারিদিকে তাকিয়ে দেখ, সংসারের জালে যতই জড়িয়ে পড়ছো, ততই তোমাকে ত্রুটিগুলো জড়িয়ে ধরছে। তোমার হালটা হাতে নিয়ে তুমি drive করে বেড়িয়ে যাবে। আগেও বলেছি, এখনও বলছি, কখনও মনে মনেও মৃত্যু চিন্তা করবে না, suicide করবে না। এর চেয়ে বড় অপরাধ আর নেই। 'বাড়ী থেকে বেড়িয়ে যাব, আর আসবো না, চলে যাব, পালিয়ে যাব,' এই ধরণের কোন কথা বলা নিষেধ। মা,বাবা ও অন্যান্য গুরুজনেরা ব্যথা পেতে পারেন, তেমন কোন কথা বলবে না।

ভুলে যেও না জন্মের সাথে সাথে সৃষ্টিতত্ত্বের বিরাট দান—দর্শন, স্পর্শন, ঘ্রাণ, শ্রবণ, স্বাদ প্রভৃতি নিয়ে এসেছ তুমি দেহযন্ত্রে। আর আছে প্রতি জীবের অন্তরে সজাগরূপে সচেতনরূপে বিরাজমান বিবেক। এই বিবেকই সদা সতর্ক প্রহরীর মত ন্যায় অন্যায়, পাপ পুণ্য বোধ সম্পর্কে জীবকে সচেতন করে দিচ্ছে। সৃষ্টির এই বিরাট সুরে ভরপুর হয়েই তুমি এসেছ। বিরাটের পথে সাধনা করে প্রকৃতির উদ্দেশ্যের সাথে একাত্ম হয়ে এগিয়ে যাও। জীবনের রথকে এইভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্যই তুমি এসেছ। খামখেয়ালের বশে জীবনকে নষ্ট করার জন্য তুমি জন্মগ্রহণ করনি। পুরোপুরি সচেতনতা হাতে নিয়ে দিগ্‌দৃষ্টির মাধ্যমে পথ খুঁজে নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা কর। বারবার বলছি, একই কথা, 'পথিক ভুল করো না, ভুলে যেও না। সময় নষ্ট করার সময় যে আর নেই।' সময় থাকতে, সাধু হও সাবধান।

অযথা রাগ, মেজাজ, জিদ অনেকটা নেশার মত, করতে সমূহ

মজা লাগে। কেমন মজা জান? চুলকানির মত। সাময়িক ভাল লাগলেও, কিছুক্ষণ পরেই জ্বলতে থাকে।

নানা সমস্যা জর্জরিত জীবনে অনেকসময়ই অনেক কিছু মনোমত হয় না, মনোমত পাও না। সাময়িক অভাব, অভিযোগ বা অসুবিধার উপরে কোন মন্তব্য করবে না। সহজ সুন্দরভাবে জীবনটাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে হলে ধৈর্য সহ্য নিয়ে চলতে হয়। আগেই বলেছি, অধিকাংশ সংসারের দিকে তাকালেই দেখা যায়, ভুলবোঝাবুঝি বেশী। ধারণার বশে চলার ফলে চিন্তা ভাবনাগুলি কখন হয় ঠিক, কখনও বেঠিক। এই ঠিক বেঠিকের ঠোকাঠুকিতে হোঁচট খেতে খেতে এগিয়ে চলেছে আজকের যুগের অধিকাংশ মানুষ। মনে দ্বন্দ্ব জাগলেই ধীর স্থির নম্র হয়ে জিজ্ঞাসা করে নেবে, 'এটা কি ঠিক?' সত্য বললে মুক্তি আর মিথ্যা বললেই ফাঁদে পড়লো। তুমি তোমার স্বচ্ছতা নিয়ে চলবে। আগেই বলেছি, প্রকৃতির স্বচ্ছতার দান বিবেক। এটি প্রকৃতির মহাদান। সুতরাং তোমাদের আর কোনকিছু হাওলাত করতে হবে না। তোমার ভিতরে যা আছে, তা দিয়েই তুমি নিজেকে গুছিয়ে নিতে পারবে। অনেক সময় ক্ষুধা লাগে, রান্নার গন্ধ পেলে ভাল লাগে, খেতে ইচ্ছে করে। প্রেম ভালবাসাও তাই। সুন্দর ছেলে, লম্বা চওড়া ছেলে দেখলে অনেক মেয়েরই ভাল লাগে। এটা হল বৃত্তির নিবৃত্তি। ছাগল গাছ পাতা দেখলে খেতে চায়, গরুও চায় শস্য খেতে। কাউকে দেখলে ভাল লাগা, খারাপ নয়। মনে কর, মন্দিরে গিয়েছ প্রণাম করতে। সেখানে একটি লম্বা চওড়া ছেলে দেখে ভাল লেগেছে তোমার। ক্ষুধার চাপে পড়ে কেমন করে ওকে ধরে আনবে, ওর ঘাড় মট্‌কাবে, ওকে ফ্যাসাদে ফেলবে, trap-এ ফেলবে, তার পথঘাট যদি বের করতে শুরু কর, তবে তুমি অপরাধে পড়ে যাবে। সব সময় তুমি কি কি ত্রুটি করছো, ভুল করছো, কাউকে বলতে হবে না। ভিতরে যে সজাগ যন্ত্রটি আছে, সেই সবসময় সজাগ করে দিচ্ছে, জানিয়ে দিচ্ছে। জানানি দিচ্ছে বলেই তো পরস্পর পরস্পরকে লুকাচ্ছে। মা বাবা আত্মীয়স্বজনকে লুকিয়ে কাজ করছে। এটি প্রকৃতির কতবড় মহাদান। সজাগওয়ালা সবসময় সজাগ হয়ে রয়েছে তোমার অন্তরে। এই সচেতনতার দিকে নজর রেখে তুমি কাজ করবে। তুমি তো তোমাকে

ফাঁকি দিতে পারছো না। ভিতরের এই সজাগওয়ালার দিকে নজর রেখে যদি চলতে পার, তবে তোমার অন্তর্নিহিত সুরে সজাগের সাড়া জাগবেই। আগেই বলেছি, এটি প্রকৃতির কতবড় মহাদান। এই মহাদানকে কাজে লাগালে তুমি নির্মল সুন্দর হয়ে ফুটে উঠতে পারবে। মনে কর, তোমার এক কোটি টাকা আছে। আচার-আচরণে বাহ্যিক আড়ম্বর নেই বলে, কেউ যদি তোমাকে বলে 'ভিক্ষুক', তোমার মনে লাগবে কি? লাগবে না। কারণ ও তো জানে না, তোমার এক কোটি টাকা ব্যাঙ্কে আছে। ব্যাঙ্কে টাকা আছে বলেই যে তুমি যখন তখন যা খুশী তাই করবে, তা নয়। প্রকৃতি সজাগওয়ালার মাধ্যমে সর্বদা পুরা capital তোমার হাতে দিয়ে দিয়েছে। সেই সজাগওয়ালার দিকে নজর রেখে চলতে পারলেই তুমি সফল হতে পারবে। সজাগওয়ালা তোমার ভিতরে যখন আছে, ধরে নিতে হবে তোমার ভিতরে ভিতরে সজাগের সুর অনন্ত ধারায় প্রবাহিত হয়ে চলেছে। আমি তোমাদের পরিষ্কার বলে দিচ্ছি, তোমাদের ভিতর থেকে যদি সচেতন করে দেয়, তোমরা কিন্তু সেইভাবেই চলবে। শিশুর মত যদি বল, 'বুঝতে পারছি না' সেখানে আমার কোন বক্তব্য নেই। বারবার বলছি একই কথা, সজাগওয়ালা প্রতিমুহূর্ত্তে সজাগ করে দিচ্ছে, ঘন্টি দিয়ে দিয়ে জানিয়ে দিয়ে যাচ্ছে, 'সময় আর নেই।' সুতরাং ফাঁকি দিলে চলবে না। ফাঁকি দিলেই গাড্ডায় পড়ে যাবে।

আগেই বলেছি, কখনও মনে মনে রাগপোষণ করে রাখবে না। রাগ করলে কোন উপদেশ ভাল লাগে না। কারও কথাই শুনতে ইচ্ছে করে না। যদি বুঝতে পার ভুল করে রাগ করেছ, রাগের যদি সমাধান হয়ে যায়, তবে আস্তে আস্তে রাগ কমিয়ে দেবে। Prestige বজায় রাখতে গিয়ে রাগ ধরে রাখবে না। মনে কর, কারও কথায় তুমি রাগ করেছ। ইচ্ছে করে তোমাকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করেছে, একথা জেনেশুনেও ভুল বুঝে থাকবে না। কে ভুল বোঝাল, না বোঝাল, সেদিকে নজর দেবে না। যাঁরা বিবেকসম্পন্ন বা চৈতন্যসম্পন্ন, তাঁরা যদি কোন কথা বলেন মনোযোগ দিয়ে শুনবে।

ভক্ত— ঠাকুর, তোমার রাতুল চরণে নিবেদন করছি, একটি

অন্তরের কথা। তুমি তো খোলাখুলি সব বলে আসছো। আরও সহজ করে বলে দাও আমাদের অন্তর্জগতের সব কথা। আমাদের ভিতরের যত ক্লেদ, গ্লানি তোমার পবিত্র স্পর্শে সব পরিষ্কার করে দাও। আজ আমরা গাড্ডায় পড়ে আছি। নানা ক্লেদ পঙ্কিলতায় আকণ্ঠ নিমজ্জিত রয়েছি। তোমার পাদপদ্ম অবলম্বন করে আমরা এই সংসার সাগর হতে উদ্ধার হতে চাই। তুমি কৃপা করে আমাদের মুক্ত করে দাও। ঠাকুর, তুমি আমাদের কাছে রয়েছ। আমরা অহোরহ কত অন্যায় অপরাধ করে চলেছি। এখন দেখছি, প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সহস্র কাজে আমাদের অপরাধের কণিকা ছড়িয়ে রয়েছে। জানি না, অপরাধ জমতে জমতে চর পড়ে গেছে কি না, আমরা রক্ষা পাব কি না। তুমিই আমাদের সূর্য। সূর্য যদি সব পাপ দগ্ধ করে দেন, তবেই পাপমুক্ত হওয়া যায়। একমাত্র তাঁর পক্ষেই সেটি সম্ভব। ঠাকুর, তোমার জ্ঞানসূর্যের আলোকে আমাদের উদ্ভাসিত করো। তুমি সদাসর্বদা আমাদের আদেশ দিয়ে চলেছ, 'পবিত্র হও, সুন্দর হও।' তোমার পরিশ্রমের তুলনা হয় না। আমাদের সুন্দর করে গড়ে তোলার জন্য কত চেষ্টা করছো। কিন্তু আমরা যেন অমানুষ হয়ে গেছি। তোমার সুন্দর মত ও পথ গ্রহণ করতে পারছি না, তোমাকে কত আঘাত দিচ্ছি। তুমি বারংবার নিজগুণে ক্ষমা করে আমাদের কাছে টেনে আনছো। আর আমরা এত পাষাণ, এত পাপী, এত অপরাধী যে আবার একইভাবে আঘাত করে চলেছি। আমাদের কিছুই হচ্ছে না। আমরা বারবার পিছলিয়ে যাচ্ছি। তোমার শ্রীচরণ ভরসা করে থাকতে পারছি না। তুমি আমাদের অন্তরের ঠাকুর, প্রাণের ঠাকুর। তোমাকে জানাই আমাদের প্রাণের কথা। তোমার আদেশ নির্দেশ পালন ছাড়া আর তো কোন পথ নেই। আমরা তো তাও পারছি না। আমরা কীটানুকীট, আমাদের কাছে থেকে তোমাকে কত নীচে নামতে হয়। আমাদের কাছে তোমাকে তোমার কাজের কৈফিয়ৎ দিতে হয়। আমাদের ক্ষমা চাইবারও ভাষা নেই ঠাকুর। তুমি তো জোর করে মনকে বেঁধে দেবে না। একমাত্র তোমার আদেশ নির্দেশ পালনের মাধ্যমেই মনকে বেঁধে নেওয়া যায়। দেবতারাও সিদ্ধি মুক্তির পথে কাউকে জোর করে টেনে নিয়ে যেতে পারেন না। আশীর্বাদ করো, তোমার আদেশ নির্দেশ পালন করে

সেইভাবেই যেন আমরা চলতে পারি। সজাগওয়ালা, সচেতনওয়ালা যদি না থাকতো আমাদের অন্তরে, সজাগের পথে যদি আমরা সাড়া না পেতাম, তাহলে বলার কিছু ছিল না। তুমি সাধারণের সাথে সাধারণ হয়ে মিশে রয়েছ। কিভাবে চললে তোমার চরণে স্থান পেতে পারি, তোমার মনের সাথে মিশে থাকতে পারি, তুমি আমাদের সেই নির্দেশ দাও। আমরা দিশেহারা। প্রতিমুহূর্ত্তে যেসব ত্রুটি করছি, সেই ত্রুটি হতে মুক্ত হয়ে তোমার কাছে যাতে সবসময় থাকতে পারি, ত্রুটিমুক্ত হতে পারি, তোমার কাছে সেই নির্দেশই প্রার্থনা করছি। আমরা যেন চিরন্তন তোমার পদসেবা, তোমার আদর্শের সেবা, নির্দেশের সেবা করতে পারি। শাস্ত্রে গ্রন্থে মহৎ ব্যক্তির আদেশ, উপদেশ শুনেছি। পৃথিবীতে কত মহান্ অবতার এসেছেন। কিন্তু জন্মসিদ্ধ মহান্ তো সচরাচর আসেন না। আমরা বহু ভাগ্যবলে তোমাকে পেয়েছি। শিশুবয়স থেকে তুমি নিয়ে এসেছো বিরাট ক্ষমতা, এতো স্বতঃসিদ্ধ। লক্ষ লক্ষ লোক একথা অবগত আছে। তুমি যে জন্মগত সুর নিয়ে এসেছ জন্মসিদ্ধ— এটা তো প্রত্যক্ষ সিদ্ধ। এখানে কোন দ্বন্দ্ব নেই। শিশুবয়সে যা নিয়ে এসেছো, প্রকৃতির সেই সুর, সেই ধারাই সবাইকে দিয়ে যেতে চাইছো। ঠাকুর, তোমার আশ্রয়ে থেকে তোমার চরণ স্মরণ করে, তোমার আদেশ নির্দেশ পালন করে যেন চলতে পারি, তুমি সেইভাবেই আমাদের আর একটু জানিয়ে দাও। আমাদের সেই আশীর্বাদই কর।

ঠাকুর— ঠিক আছে, তোমাদের প্রার্থনা শুনলাম। আমি যা বলি, সেইভাবে যদি চল, তাহলে তো কথাই থাকে না। বেশীরভাগই নির্দেশানুসারে চলে না, তাই দুঃখ পাই, চুপ করে থাকি। তোমরা জানতে চেয়েছো, সেই পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকটি কথা বলছি।

প্রথমতঃ আমার সম্বন্ধে তোমরা কিছু কিছু ওয়াকিবহাল হয়েছ, সেই হিসাবেই বলছি, আমি যে কথা একবার বলবো, সেটি মনে প্রাণে বিশ্বাস করে নিয়ে সেইভাবে চলার চেষ্টা করবে। একই কথা যেন আমাকে বারবার না বলতে হয়।

দ্বিতীয়তঃ যে কথাটি বলবো, সেটিকেই চরম নির্দেশ হিসেবে পালন করবার চেষ্টা করবে। আমার কোন কাজের জন্য যেন কাউকে

কৈফিয়ৎ না দিতে হয়। নিজেকে মহান্ বা বিরাট বলে যেন বারবার উচ্চারণ না করতে হয়। মহান্ তিনিই হন, যিনি নিষ্পাপ এবং সমস্ত ত্রুটি বিচ্যুতির ঊর্দ্ধে। তাঁর কখনও পাপ হয় না, ত্রুটি হয় না। সর্বক্ষমতা তাঁর করায়ত্ত। তোমরা সাধারণের সঙ্গে মিশিয়ে সাধারণের মত যদি তাঁকে চিন্তা কর, অপরাধ হবে। ঠাকুর, কোন্ মুহূর্ত্তে কাকে নেবেন, কাকে কাছে টান্‌বেন, কাকে দূরে সরাবেন, তিনি কার সাথে বেশী কথা বলেন, কার সাথে কথা বলেনই না, বিচার করতে যাবে না। সেসব চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। তিনি গড়তে এসেছেন। গড়বেন। কাকে কিভাবে গড়বেন, সেই কৈফিয়ৎ চাইবে না। তোমরা চাইবে আদেশ, নির্দেশ। প্রতিমুহূর্ত্তে মনে রাখবে তিনি জন্মগত, জন্মসিদ্ধ। তাঁর সম্পর্কে মনে কোন দ্বন্দ্ব আনবে না। তিনি এখানকার কোন শাস্ত্র, গ্রন্থ পাঠ করে শাস্ত্রজ্ঞ হন নি। প্রকৃতির বিরাট গ্রন্থ তিনি পাঠ করেছেন। প্রকৃতির ধারাপাতা, প্রকৃতির আদর্শলিপিই তাঁর আদর্শ। বিশ্বপ্রকৃতির গণিতের সাথে জীবনের গণিত মিলিয়ে মিলিয়ে প্রতি পদক্ষেপে তিনি চলেছেন। তাঁর সবটাই যে প্রকৃতির সুরে সুরময়। মনে রাখবে, তিনি কখনও বেসুরে যান না। বেসুরকে সুরে আনাই তাঁর কাজ। তিনি কখন কাকে কি করেন না করেন, চিন্তা করবে না। যদি তুমি মন খারাপ কর, 'ঠাকুর আমাকে টানেন না। আমাকে ভালবাসেন না, আগের মত ডাকেন না' ইত্যাদি বলে মনে মনে গুমড়াতে থাক, তাহলে অপরাধ হবে। ঠাকুর কি চিন্তা নিয়ে কি কাজ করছেন, তাতো তুমি জান না। তুমি যদি অভিমান করে বসে থাক, আর তোমাকে বারে বারে ডাকতে হয়, মান ভাঙাতে হয়, তাহলে নির্দেশ পালন করবে কখন? এক কথায় তিনি যা করবেন, তা দেখতে যাবে না। তিনি যা বলবেন, তোমার উপরে যে আদেশ নির্দেশ জারী করবেন, সেইভাবে চলার চেষ্টা করবে। তাহলেই নিষ্পাপ হয়ে ত্রুটিমুক্ত হতে পারবে, আর কোন পাপ থাকবে না। একমাত্র জন্মসিদ্ধ মহান্‌ই সর্বপাপ হ'তে মুক্ত করতে পারেন। কিন্তু সাধারণ সংসারের ভাবভাবনা যুক্ত হয়ে এই বিরাটের চিন্তাতে মানুষ থাকতে পারে না। তোমরা কখনও এমন করবে না। **সর্বদা মনে রাখবে, তিনি মহার্ণবে আছেন, মহার্ণবের সুর বাজাচ্ছেন। সেই সুরে, সেই বন্দনায়**

আত্মোৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত থাকবে। ঢাকঢোল পিটিয়ে, অন্য সুর বাজিয়ে মহার্ণবের সুর বন্ধ করা যায় না। এখানে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করেছেন যারা, তাদের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। যিনি বহুজন্মের সুরসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেই জন্মগ্রহণ করেছেন, তিনিই একমাত্র সর্ব অপরাধ হতে মুক্ত করে নিষ্পাপ করে নিতে সক্ষম। এ ছাড়া আর কে পারবে, জানি না। সেই বিরাটের সুরে ডুবে থাকলে, বিরাটের সুরে চললে, এর চেয়ে আনন্দ আর কি হতে পারে? ডোবার পারে বসে কি সঙ্গীতের সাধনা হয়? সাগরের পারে থাকলে আপনিই সুর ভেসে আসে। জন্মগত মহানের সান্নিধ্যে থাকলে সেই আনন্দ থেকে, তৃপ্তি থেকে, সেই সুর থেকে দূরে সরে যাবে না।

ভক্ত— ঠাকুর, তোমার আদেশ যেন আমরা নতমস্তকে পালন করি। আমরা যেন নিরভিমান নিরহঙ্কার হয়ে, শান্ত নম্র ধীরস্থিরভাবে তোমার চরণে আজ্ঞাবহ হয়ে থাকতে পারি। সেই আশীর্বাদই আমাদের কর ঠাকুর। আর আমাদের বলার কিছু নেই।

ঠাকুর— আমি যে আদেশ নির্দেশের গণ্ডী বেঁধে দিলাম, তার বাইরে তোমরা যাবে না। তবেই সামাল দেওয়া যাবে। নাহলে কিন্তু সম্ভব নয়। লক্ষ্মণ সীতাকে বলেছিল, 'এই গণ্ডী বেঁধে দিলাম। এর বাইরে গেলেই ভুল করবে।' এমনই দুরদৃষ্ট, সীতা গণ্ডীর বাইরে গেল। আর এতবড় কাণ্ড ঘটে গেল।

যাঁরা মহান্ অবতার বা বিরাট পুরুষ, জন্মগত সুর নিয়ে আসেন যাঁরা, তাঁদের কাজ বুঝবার সাধ্য সাধারণ মানুষের নেই। একজন মহানের কথা বলছি। তিনি সবাইকে বলেছেন দক্ষিণে যাবেন। কিন্তু যখন যাত্রা শুরু করলেন, দেখা গেল, তিনি যাচ্ছেন উত্তরে। সকলে বলাবলি করছে, 'মহান্ বলেছেন দক্ষিণে যাবেন, কিন্তু তিনি যাত্রা করেছেন উত্তরে। বুঝলাম না এর রহস্য।' মহান্ কিছুই বলছেন না। কোনদিকে দৃষ্টি নেই তাঁর। দক্ষিণে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত কয়েক হাজার যাত্রীকে তিনি নিয়ে চলেছেন উত্তরে। তারা একে অন্যের দিকে তাকাতাকি করছে। কেউ কেউ আবার কোন একজনকে বলছে, 'তুমিই তো ডেকে এনেছ। এ আবার কি পরিস্থিতির মধ্যে পড়লাম'। মহান্

দেখেনই না। কিন্তু তিনি বুঝছেন, এদের মধ্যে একটা আলোড়ন চলেছে। তিনি যাচ্ছেন মাঠের মধ্য দিয়ে মাসের পর মাস। হাজার হাজার দক্ষিণ মার্গ গমনেচ্ছু যাত্রীরা ক্রমশঃই অধৈর্য হয়ে উঠেছে। মহান যে ক্রমশঃই উত্তরের পথেই যাচ্ছেন। হাজার হাজার যাত্রীর অনেকেই হতাশ হয়ে পথের মাঝে বসে পড়েছে। আর আছে ২০০ জন। ক্রমে ক্রমে আরও অনেকেই বিফলমনোরম হয়ে মহানের সঙ্গ পরিত্যাগ করলো। শেষ পর্যন্ত রইল ৫০ জন। তারা বলছে, 'যা হয় হবে, আমরা মহানের সঙ্গ ছাড়বো না। তিনি যখন চলেছেন, আমরা উত্তরেই যাব।' শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, উত্তরের পথে যেতে যেতে নানা নদনদী, মাঠ-প্রান্তর অতিক্রম করে, বহু দেশ বিদেশ ঘুরে, নানা অভিজ্ঞতা ও আনন্দ সঞ্চয় করে মহান্ দক্ষিণেই এলেন। এতক্ষণে পিছনে তাকিয়ে তিনি দেখেন, হাজার হাজার যাত্রীর পরিবর্ত্তে মাত্র পঞ্চাশ জন তাঁর সঙ্গে রয়েছে।

'ওরা কোথায়?' মহান জিজ্ঞাসা করাতে একজন বললো, 'আপনি উত্তরমুখী হয়ে গমন করাতে ওরা হতাশ হয়ে ফিরে গেছে।' ফেরার পথে রাস্তায় রাস্তায় তিনি ডাকলেন সবাইকে, 'তোমরা বসে পড়লে কেন?'

—আজ্ঞে, আপনি উত্তরে যাচ্ছেন বলে আমরা পথে বসে পড়েছি।

—মহান বলছেন দেখ, আমার গন্তব্যস্থল দক্ষিণে, আমি দক্ষিণেই যাব। ঘুরতে ঘুরতে দক্ষিণে আসা কি যায় না? উত্তরের পথে যাত্রা করলেও আমি তো ঠিকই দক্ষিণে এসেছি। সুতরাং অসুবিধা কোথায়।

—আজ্ঞে, আমরা বুঝতে পারিনি।

—বুঝতে যখন পারনি, বুঝতে কেন গেলে? তোমরা আমার সন্তান। তোমাদের কাছে আমি কৈফিয়ৎ কেন দেব? উত্তরে গিয়েছি কেন জান? বহুজনের সাথে মিশে, বহু দেশ ঘুরে বহু অভিজ্ঞতার মাঝে তোমাদের আমি গড়তে চেয়েছিলাম। তাই আমি এইভাবে ঘুরে ঘুরে দক্ষিণে এলাম। তোমরা এমন করে নিজেদের বঞ্চিত করলে কেন?

—আজ্ঞে, আমরা অন্যায় করেছি।

—এতো অতি সহজ কথা। অন্যায় করেছি। আর করবো না।

—আপনি যে ঘুরতে ঘুরতে আবার দক্ষিণেই আসবেন, বুঝতে পারিনি।

যে ৫০ জন বরাবরই মহানের সঙ্গে ছিল, তারা আনন্দে আত্মহারা হয়ে বলতে লাগলো, 'আমরা কত অদ্ভুত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলাম। কত আনন্দ পেলাম। উত্তরমুখী হয়েও আমরা দক্ষিণমুখী হতে পারলাম, দক্ষিণে যাত্রার ফল পেলাম।'

তাই বলেছি, জন্মসিদ্ধ মহান্ কখন কোন্ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে কি করবেন, না করবেন জানানো সম্ভব নয়। তোমরা শুধু নির্দেশ পালন করে যাবে। বগী গাড়ীর মত ইঞ্জিন ধরে ধরে চলতে থাকবে। যদি সেইভাবে ইঞ্জিন ধরে থাকতে পার, ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় পৌঁছে যেতে পারবে।

ভক্ত— আজ্ঞে, আপনি আশীর্বাদ করুন, আমরা যেন তাই পারি।

ঠাকুর— কিভাবে ভুলের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়, তোমরা জেনে গেলে। সুতরাং তোমরা অতি সহজে ভুলগুলি পরিষ্কার করে নিতে পারবে। সেই ধারা, সেই নির্দেশ জারী হয়ে গেল তোমাদের উপর। এটি তোমাদের পক্ষে অতি মঙ্গল। কেউ যদি সব জেনেও আরও বেশী ভুলের পথে পা বাড়ায়, তবে তার অপরাধ হবে অনেক গুণ বেশী। তাকে তখন মারাত্মক অপরাধের জালে জড়িয়ে পড়তে হবে।

অনেক সময় তোমাদের ধারণা, 'ঠাকুর তো সবই জানেন, সবই বোঝেন। ঠাকুর তো অন্তর্যামী, তাঁকে আর কি বলবো?'

জেনে রাখ, সব জানলেও ঠাকুর সব সময় জানার যন্ত্র fit করে রাখেন না। তিনি সাধারণের সাথে সাধারণ হয়ে মিশে থাকতেই ভালবাসেন। তিনি দেখেন, তাঁর সাথে ছল, চাতুরী, মিথ্যা, প্রবঞ্চনা কে কতটা করে চলেছে। বিশেষ প্রয়োজন হলে তবেই তিনি যন্ত্রটি খুলবেন। অষ্টাবক্র মুনির কাহিনীটি জানো ত? একবার তিনি বসে আছেন শিষ্য পরিবৃত হয়ে। হঠাৎ দেখা গেল আর একজনও অমন অষ্টবক্র হয়ে নড়াচড়া করছে অর্থাৎ তার দেহটিও অমন অষ্ট স্থানে বক্র হয়ে আছে। শিষ্যরা বলছে, 'গুরুদেব, দেখুন, দেখুন, আপনাকে অনুকরণ

করে বিদ্রূপ করছে।'

অষ্টাবক্র মুনি বলছেন, 'না জেনে, বিদ্রূপ করছে, বলছো কেন? ওর দেহের আকৃতিতো অমন হতে পারে।' তবু শিষ্যদের সন্দেহের নিরসন হয় না। তখন তিনি বললেন, 'ঠিক আছে, যদি সে সত্যিই আমাকে ভেঙায়, তাহলে তার দেহ অমনই থাকবে। আর যদি তা না হয়, তবে সে এই মুহূর্ত্তে সুপুরুষ হয়ে যাবে।'

মুনির বাক্য ব্যর্থ হল না। সে তৎক্ষণাৎ বিকৃতাঙ্গ পরিত্যাগ করে অপরূপ সুন্দর দেহ ধারণ করলো। তাই বলছি, বিশেষ কোন প্রয়োজন হলেই মহান্‌রা অন্তর্দৃষ্টি খুলে দেখে থাকেন। না হলে সব সময় focus করেন না। এই কারণেই বিশেষ প্রয়োজনীয় ক্ষেত্র ছাড়া 'কেন, কিসের জন্য কি হচ্ছে, সব সময় বলা হয় না।'

তোমরা অযথা কাউকে ভুল বুঝবে না, ভুল চিন্তা করবে না। সব সময় সুন্দর হয়ে থাকবে। জন্মসিদ্ধ মহান্ যখন যেভাবে বলেন, সেভাবে চললে আর কোন বাধা থাকে না। আমি কাকে কিভাবে গড়াবার জন্য কখন কিভাবে রাখি, দক্ষিণে বলে উত্তরে পাঠাই, উত্তরে বলে পশ্চিমে পাঠাই, সে বিষয়ে ভুল বোঝাবুঝি না করে নির্ভর করে থাকবে। মনে করবে, 'বাবা যখন হাত দিয়েছেন, আমরা তো বুঝি না। তখন নির্ভর করেই থাকি।'

মহান ব্যক্তি সোনাগাছি গিয়েছেন। ভক্তরা আগেভাগে দৌড়ে দৌড়ে যাচ্ছে। তিনি প্রেমালিঙ্গন দিচ্ছেন।

ভক্তরা একেবারে আষ্টেপৃষ্টে জড়িয়ে ধরেছে। মহান্ মদের বোতল হাতে নিয়েছেন। ভক্তরা দুটি করে বোতল নিয়েছে। একটি থেকে গলায় ঢালছে, আরেকটি বগলে রেখেছে।

মহান্ নাচছেন।

ভক্তরা একেবারে ঢলে ঢলে নাচছে। সবাই বলছে, কি ভক্ত, কি গুরুগত প্রাণ। গুরু যা করছেন, ভক্তরা তাই করছে। মহান্ শুয়ে আছেন। ভক্তরা মেয়েদের সঙ্গে বিছানায় শুয়ে ঢলাঢলি শুরু করেছে। মহান্ গাঁজা খাচ্ছেন। ভক্তরা ছিলিমের পর ছিলিম গাঁজা টানতে শুরু

করেছে। সবই যে গুরুর প্রসাদ। একেবারে গুরুগত প্রাণ। এইভাবে ছয় মাস কাটলো। একদিন মহান্ বললেন, চল যাই যাত্রা শুরু করি।

যেতে যেতে তিনি এক কর্মকার বাড়ীতে প্রবেশ করলেন। সেখানে লোহা গরম করে নানারকম shape তৈরী করা হচ্ছে। টক্‌টকে লাল লোহা। মহান্ আগুন থেকে খানিকটা লাল লোহা নিয়ে আইস্‌ক্রীমের মত চুষতে লাগলেন। এই দেখে তো শিষ্যবর্গের প্রাণ উড়ে গেছে। আর তো কেউ এগিয়ে আসে না। কে কার পিছনে গিয়ে দাঁড়াবে, তারই জন্য ব্যস্ততা শুরু হয়ে গেছে।

মহান্ ডাকছেন তাদের, 'তোমরা এস, লাল লোহার আইস্‌ক্রীম খাও। না এলে চাবুক মারা হবে।'

তখন সবাই গেল পালিয়ে। এতক্ষণ পূবে, পশ্চিমে, উত্তরে, দক্ষিণে মহান্ যেদিকেই গেছেন, যা করেছেন, সবাই তা করেছে। লাল লোহার আইস্‌ক্রীম খেতে কাউকে আর পাওয়া গেল না। তখন বোঝা গেল, মহানের কি মারাত্মক শক্তি।

তাই বলছি, ঠাকুর কখন কি করেন, না করেন, বিচার করতে যেও না। তাঁকে ধরা ভীষণ মুস্কিল। ধরতে গেলেই ফেঁসে যাবে। 'সাধু হও সাবধান।'

ভক্ত— ঠাকুর, আজ অনেকটা পরিষ্কার হয়ে গেল। বহু বিজ্ঞাসার উত্তর পেলাম। কত যে তোমাকে জ্বালাচ্ছি। অপরাধের পাহাড় করে ফেলেছি। একমাত্র তুমিই সব অপরাধ পুড়িয়ে ছাই করে ফেলতে পার। ঠাকুর, তোমার কৃপায় আমরা যেন ত্রুটিমুক্ত হয়ে জীবনের পথে চলতে পারি।

ঠাকুর— পারলেই ভাল। আরও অনেক কিছু বলার ছিল। এখন আর বেশী কিছু বললাম না। পরে আস্তে আস্তে বলবো। আজ এখানেই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

আমাদের জীবনের প্রতি স্তরে স্তরে প্রতিটি অণু পরমাণুতে ঘিরে রয়েছে এক অভিশপ্ত জীবনের ধারাপাতা

১লা জুলাই, ১৯৯০
সুখচর ধাম

প্রশ্নকারী— ঠাকুর, আজ কয়েকদিন যাবৎ আমরা আসছি আর যাচ্ছি। এখানে জনসমুদ্রের ঢেউয়ে উথাল পাথাল হয়ে আপনার কথাই শুধু ভাবছি। লক্ষ লক্ষ মানুষ আপনার অন্তরের টানে, স্নেহ মমতা ভালবাসার টানে এক লক্ষ্যে ছুটে চলেছে, এমন মধুর দৃশ্য না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। আপনি এত ব্যস্ত, এতটুকু অবসর নেই আপনার। একটু সময় করে যে আমাদের সাথে দুটো কথা বলবেন, সেই সময়টুকু খুঁজে পাচ্ছি না।

ঠাকুর— সমুদ্র কিছু গ্রহণ করতে চায় না। সমুদ্র পারেই পৌঁছে দেয়, জানো ত? তাই জনসমুদ্রের ঢেউয়ে এবার এসে পারে ঠেকেছে। বল কি জানতে চাও?

প্রশ্নকারী— আজ্ঞে, জানার তো অনেক ছিল। কোন্‌টা আগে জানতে চাইবো, সেটাই ভাবছি।

ঠাকুর— তোমাদের জানার তো থাকে অনেক। জানতে চাইলে যতটা পারি, জানিয়ে দেবার চেষ্টাও করছি। তাতে ফলাফলটা কি হচ্ছে? তোমাদের প্রত্যেকের মুখে প্রত্যেকের কাছে প্রায় একই সংবাদ। এই জনসমুদ্রে যে হাজার হাজার মানুষ আসছে, একই সংবাদ নিয়ে 'বাবা, ভাল লাগছে না'। অথচ এই **ভাল লাগাবার জন্য, এই জগতে কি না করতে হচ্ছে, কি না হচ্ছে, একবার ভেবে দেখেছ কি? শুধু ভাল লাগা একটু ভাল থাকা; আর ভাল থাকার জন্য চাই ভাল ব্যবস্থা। এই ভাল ব্যবস্থার ব্যবস্থা করতে গিয়ে কোন ব্যবস্থাই কিন্তু টিকছে না।** তোমরা কি সাংবাদিক?

প্রশ্নকারী— আজ্ঞে হ্যাঁ, আমরা সাংবাদিক।

ঠাকুর— এই জগতে ভাল লাগার জন্য, ভাল থাকার জন্য, ভাল রাখার জন্য আর ভালবাসার জন্য কত যে ভাল ব্যবস্থা করে যাচ্ছে, সেটাও একটা জানবার বিষয়। বল তো সাংবাদিক, এই আজ পর্যন্ত যত তোমার বয়স হ'ল, কি তোমার ভাল লেগেছে? কোন্ বিষয় ভাল লেগেছে?

প্রশ্নকারী— আজ্ঞে, তাতো সঠিক বলতে পারবো না। শিশুবয়সে একরকম কাটিয়েছি, এইবয়সে আরেকরকম কাটাচ্ছি। কোন্টা যে ঠিক, আর কোন্টা বেঠিক, কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না।

ঠাকুর— একরকম ভাল লাগা আছে, জানো ত? সেটাকে বলে অবুঝের আনন্দ। শিশু বয়সে যেরকম একটা আনন্দ লাগে, ভাল লাগে, পরবর্ত্তী জীবনে তেমনটি আর খুঁজে পাওয়া যায় না। শিশুকালে দেখা যায়, সবকিছুই মানিয়ে নিচ্ছে। সেটার মধ্যে বুঝের ভাবটা কম থাকে। সেই বয়সটায় প্রায় সকলেই মনে করে, এইটাই জীবন, এইটাই শেষ পর্যন্ত থাকবে। অল্প বয়সে দেখা যায়, একেকটা বিষয় নিয়ে মাতামাতি করছে অনেকে। তখন তারা মনে করে, এইটা এইভাবেই চলবে। তার মধ্যে মৃত্যুর চিন্তা নাই। কোন অভাব অভিযোগের ঢেউ এসে তেমন বাড়ি খায়নি। যখন যে অবস্থা আসছে, মনের আনন্দে সেটাই চালিয়ে নিচ্ছে। তার মধ্যেই আবার ত্রুটি-বিচ্যুতি করে যাচ্ছে।

প্রশ্নকারী— আজ্ঞে, সেই ত্রুটি-বিচ্যুতিগুলি কেমন?

ঠাকুর— সেই বয়সে যেসব ঘটনাবলী ও মাতামাতি, মাখামাখি অর্থাৎ যেসব অবস্থা চলতে থাকে, যখন সেটায় টান পড়ে, তার ব্যবস্থা করতে গিয়েই ত্রুটি-বিচ্যুতি করতে থাকে। যেমন মনে কর, পিকনিক করবে, পয়সা তো চাই। রোজগার করে না, পয়সা চাইলে বাবা মা দেন না, তখন তারা লুকিয়ে পয়সা জোগাড় করার চেষ্টা করে। পকেট থেকে হোক, এদিক ওদিক করে হোক, যেভাবেই হোক, পয়সা জোগাড় করে পিকনিক যাওয়া চাই। **এই যে লুকিয়ে কাজটা করলো, এটা যে মারাত্মক ত্রুটি, সেটাও তেমন বুঝতে পারলো না। সে মনে করলো, 'কেউ টের তো পেল না। অথচ টাকা জোগাড় করে ফেলেছি। বাবা মাও আমাদের অবিশ্বাস করেন না। তারা ভাবতেও পারেন না যে, এই কাজ করবো,' এই চিন্তা করে সে মনে মনে একটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করলো। কিন্তু এই যে শুরু হয়ে**

গেল, এই শুরুটা জীবনভর রয়ে গেল। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত্ত পর্যন্ত অর্থাৎ শেষ নিঃশ্বাস ফেলার আগে পর্যন্ত জীবনের নানা ঘটনায়, নানা ঘাত প্রতিঘাতে, নানা বিভাগে এই ধরণটা কিন্তু রয়েই গেল। এই ধরণের ঘটনাগুলো থেকে রেহাই পাবার আর কোন উপায় রইলো না। কিন্তু আরও অল্প বয়স যাদের, যারা দেড় বছর, দু'বছরের শিশু তারাও তাদের নিজস্ব ধারায় আনন্দে থাকার চেষ্টা করছে। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, ভাল না লাগলে ভাল লাগার জন্য শিশুরাও ব্যবস্থা করে নিচ্ছে। মনে কর, একটি শিশু ছাদের কার্নিশে গিয়ে বসে আছে। সে যে পড়ে যেতে পারে, সেটা ভাববার তার সময় নাই। একটু এদিক ওদিক হলেই সে যে পড়ে গিয়ে মরে যাবে, সেই বোধশক্তিটা তখনও জন্মায়নি। কিন্তু সেও আরাম চায়। সে মনে করলো, 'এমন জায়গায় এসে বসেছি, কেউ আমাকে স্পর্শ করতে পারবে না। কেউ কিছু করতে পারবে না। আমি ইচ্ছে করলে দৌড়ে যেতে পারি, ইচ্ছে করলে লাফিয়ে পড়তে পারি, যা খুশী তাই করতে পারি।' ছাদের কার্ণিশে বসে যার বোধশক্তি এইরকম, আগেই বলেছি, যেকোন মুহূর্ত্তে পড়ে যেতে পারে, এই বোধশক্তি যার নেই, তার সব বোধগুলিই সেইরকম। তার ভাল লাগার বোধ, সুখে থাকার বোধ, ভাল না লাগার বোধ, সব একরকম। মনে কর, কাউকে যদি সজ্ঞান অবস্থায় অপারেশন করা হয়, তবে তার অবস্থা একরকম। আর যদি অজ্ঞান, অচৈতন্য অবস্থায় অপারেশন করা হয়, তবে অবস্থা সম্পূর্ণ অন্যরকম। অচৈতন্য অবস্থায় হাত-পা কেটে ফেলে দিলেও তা অনুভব করতে পারবে না। তাতে কি এটাই বোঝা গেল যে, তার ধৈর্য সহ্যের পরিমাপ অপরিসীম, একটু উঃ আঃ পর্যন্ত করলো না। তাতো নয়। আমরা এই সমাজে এমন একটা অবস্থায় বাস করছি যে, নেচার (Nature) থেকেই যেন সর্বদা একটা ব্যস্ততার মধ্যে, লাফাঝাঁপির মধ্যে আমাদের রেখে দিয়েছে। যতক্ষণ এই লাফাঝাঁপির মধ্যে থাকি, আমরা ভুলে থাকি। আসল চিন্তা থেকে এইভাবেই আমাদের দূরে সরিয়ে রাখছে। কাউকে খুন করার জন্যই হোক অথবা অন্য যেকোন কারণেই হোক, কারও নামে যদি ওয়ারেন্ট বের হয়, তবে চিন্তায় পাগল করে দেয়, বাড়ি থেকে পালিয়ে ঘুরতে থাকে। তার তো চিন্তা আছেই। বাড়িশুদ্ধ লোক তার চিন্তায় চিন্তিত। একটি ওয়ারেন্টের ভয়েই এত বিচলিত।

কিন্তু প্রকৃতির আইনে তারচেয়ে অনেক বড় ওয়ারেন্ট, অনেক বড় শাসন যে জারী করা আছে আমাদের উপরে, কেউ কি ততটা ভাবে? যদি ভাবতো, এটা যদি ভাবতেই পারতো, তবে আজকের সমাজের চেহারাটা এমন দুর্দশাগ্রস্ত না হয়ে অন্যরকম হ'তো। কারণ এখানে আমরা যা কিছু করছি, সবই সাময়িক। লেখাপড়া, চাকরী-বাকরী, যে যাই করুক না কেন, বিবাহাদি করে স্ত্রী-সন্তানাদি নিয়ে যতই সুখের ঘর গড়ুক না কেন, মৃত্যুর হাত হ'তে কেউ রেহাই পাবে না। মন্ত্রী, রাজা, মহারাজা যে যতই তুঙ্গে উঠছে, দাপটে অহঙ্কারে পারিপার্শ্বিক অবস্থায় তাকে একেবারে 'হুজুর হুজুর' করে ডাকছে, সবাই সেলাম ঠুকছে, অপর্যাপ্ত অর্থের ভাণ্ডারের মালিক হয়ে বসেছে, আহারে বিহারে যশে মানে প্রতিষ্ঠায় কোনদিকে কোন অভাব নেই, কিন্তু মৃত্যুর শমন চিন্তা করে আমাদের এই কথাটা কি মনে আসে না যে, 'ভাল লাগছে না।' কারণ তুমি তো দাঁড়িয়ে আছ, তুমি তো রাজা মহারাজা ব'নে আছ, **তোমার সামনে ৪/৫টি ফটো ঝুলছে, সেই ফটোতে দেখা যাচ্ছে, তোমার বাবা নেই, তার বাবা নেই, তার বাবা নেই, শুধু স্মৃতিগুলো রয়ে গেছে। ফটোগুলো যেন তোমাকেও সাবধান করে দিচ্ছে, তোমার ফটোও এরকমভাবে ঝুলবে। তোমার ছেলে সেই ফটো দেখে চিন্তা করবে, 'আমার বাবা নেই।' এরকম প্র্যাক্টিক্যাল দৃশ্য দেখার পরে আর কি কিছু ভাল লাগে? মৃত্যু যেখানে অবশ্যম্ভাবী, সেরকম ক্ষেত্রেই আমরা বসবাস করছি।** আমার এখানে প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ আসে, তোমরাই বলছো জনসমুদ্র, তাদের কারও মনে শান্তি নেই। দুঃখে কষ্টে ব্যথায় বেদনায় রোগে শোকে, অভাবে অভিযোগে আঘাতে আঘাতে সবাই জর্জরিত।

বল, সাংবাদিক, কি বলবে বল?

সেই বাচ্চা বয়স থেকে আমি মানুষের এই আর্তনাদ, এই মর্মভেদী হাহাকার শুনে আসছি। প্রতিনিয়তই চলেছে আমাদের এই দুঃখ ব্যথা কষ্ট। ভেবে দেখ সাংবাদিক, আর তো সেই সময় নাই। যখন শিশু বয়সে বাবা বাবা ব'লে ডাকতাম, মা মা ব'লে ডাকতাম, জ্যাঠা, খুড়া, মাসি, পিসীদের কাছে কত আবদার করতাম। তখন ভাবতেও পারিনি, কেউ তারা থাকবে না। তখন মনে হয়েছিল, তারা কেউ মরবে না। কিন্তু চোখের সামনে একে একে তারা সব চলে গেল। এক একজন করে চলে গেছে, আর কান্নায়

ভেঙে পড়েছি। এই বয়সে আমরাও তো আবার সন্তানের বাবা হলাম। সেই সন্তানেরা আমাদের মতই ভাবছে, আমরা কোনদিন মরবো না। শিশুরা ভাবছে, আমরা চিরদিন থাকবো। হায়রে প্রকৃতির খেলা। হায়রে প্রকৃতির রহস্য। **আমরা সবাই চল্‌তি পথের পথিক। কোথায় গেল সেই রাজারা, সেই মন্ত্রী আর সম্রাটগণ। ঐ সাড়ে তিন হাত জায়গাটুকু নিয়েই সবাই চলে যাচ্ছে। ঐ সাড়ে তিনহাত জায়গার সীমানাতে সবাই শুয়ে পড়ছে। ওখানে সবারই সমান আসন। ঐটাই মনে হয়, সত্যিকারের সাম্যনীতি।** ঐখানে কোন ঝগড়া বিবাদ নাই, জায়গা নিয়ে মারামারি নাই। একই সাড়ে তিনহাত জায়গায় সবাই এসে শুয়ে পড়ছে। মার্বল পাথরের ঘরে যে বাস করে, ডায়মন্ড যার পেপার ওয়েট, সেই সম্রাট আর হরিজনভাই, মৃত্যুর পরে কোন তফাৎ নাই। একই শ্মশানঘাটে উভয়ের সমান স্থান। জানি না, তোমাদের সাম্যবাদের কি ব্যাখ্যা আছে। কিন্তু এই সাম্যবাদে সবারই স্থান এক। মৃত্যুর পরে স্মৃতিরক্ষার্থে যতবড় তাজমহলই নির্মাণ করা হোক না কেন, সেই তাজমহলের মূল্য আর যদি কেউ একটা ঢিপির তলায় থাকে, সেই ঢিপির মূল্য সমান। তবু কিসের আশায়, কোন্ নেশায় চলছি আমরা? বলতো সাংবাদিক, সমস্ত জগৎবাসী কিসের আশায় কোন্ নেশায় চলছে? জগৎবাসী বলতে শুধু মানুষ নয়, একই চন্দ্র সূর্যের তলায় যারা বাস করে, তাদের সবাইকে নিয়েই কথা বলছি। সবাই চলছে আপনমনে কোন্ ভরসায় কে জানে? কিন্তু প্রকৃতি তার সৃষ্টবস্তুর মাধ্যমে কি ইঙ্গিত দিচ্ছে? প্রকৃতির দৃষ্টিতে প্রকৃতির ধারাপাতার ধারা ধরে ধরে যদি পথ চলি, প্রশ্ন কি জাগে না এই ধরিত্রীর সৃষ্টি কেমন হল? কি করে এল? এ আবার অন্য বিষয়বস্তু। সেখানে আমি হস্তক্ষেপ করছি না।

সাংবাদিক— আজ্ঞে, আপনি কৃপা করে এই বিষয়ে একটু ইঙ্গিত দিন।

ঠাকুর— এই বিষয়ে বলতে গেলে, এটা একটা বিরাট সাবজেক্ট। কেন এই সৃষ্টি? কিভাবে সৃষ্টি? এই সৃষ্টির উৎস কি? এই বিষয়ে আরেকদিন তোমাদের খুলে বলবো। দেখতো, এখনও প্রচুর দর্শনার্থী অপেক্ষা করছে।

সাংবাদিক— আজ্ঞে, দর্শনার্থীরা অপেক্ষা করছে, তারাও শুনবে। আপনি কৃপা করে এই বিষয়ে একটু খুলে বলুন।

ঠাকুর— জগৎবাসী যে বাঁশীর সুরে চলছে, সেটি আজ বেসুরো হয়ে বাজছে। তাই সুরে কি পৌঁছতে পারবে? সবাই যেন ক্ষুধার জ্বালায়, আশ্রয়ের সন্ধানে সুখের ঘর তৈরী করার জন্য এবং বালবাচ্চাদের রক্ষা করার জন্য ছুটে চলেছে। চোখ বন্ধ করে যদি চিন্তা কর, এই একই দৃশ্য ফুটে উঠবে। বিশ্ববাসীর চোখের সামনে এই দৃশ্যটাই তুলে ধর। স্রোতের মত ধুলো যেমন আকাশে ওড়ে, বাতাসে ওড়ে, এইরকম স্রোতের মত চলছে সবাই। প্রায় সবারই অন্তরের চাহিদা এইরকম, 'খাওয়া চাই, পরা চাই। সুখে শান্তিতে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে চাই।' এদিকে সন্তানাদি হচ্ছে। আবার তাদের লালন-পালনের চিন্তা। এটাই কি একমাত্র দিন কাটানোর বিষয়বস্তু? এই কি পেসেন্স খেলা? সাময়িক এই জীবনের খেলাতে সারাক্ষণ ব্যতিব্যস্ত হয়ে থাকলে প্রকৃতির আসল রহস্য ও উদ্দেশ্যের প্রতি কোনদিনই মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না। জীবনের পথে শুধুই স্ত্রী-পুত্রের কান্না, মা-বাবার কান্না, আত্মীয় স্বজনের কান্না, সুখশান্তির কান্না। তারপর একটার পর একটা ঝামেলা ঝঞ্ঝাট লেগেই আছে। এ যেন এমন এক বিষয়বস্তু, খোসা দিয়েই যা তৈরী। চালতা আর পেঁয়াজের মত খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে বস্তুটা আর থাকছে না। খোসা বাদ দিলে চালতা আর নেই। খোসাটাই শুধু পড়ে রইল। কম্বলের লোম বাছতে বাছতে কম্বলটা আর খুঁজে পাওয়া গেল না। লোমগুলি রয়ে গেল। আসল বস্তুটা কোথায়? সেটা তো খুঁজে পাচ্ছি না। এত ব্যস্ত আমরা, সবাই তো চলেছি আশার পানে। তারপর মায়া, মোহ যশ লোভ যা কিছু আছে, সবকিছু নিয়েই উন্মাদের মত ছুটে চলেছি। তারপর কি করছি? যেটা আজ চলছে সমাজের বুকে— স্তরে স্তরে এমনভাবে পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে যে, ফেলে দিয়েও শেষ করা যাচ্ছে না। আজ আমরা সত্যভ্রষ্ট, আদর্শচ্যুত, ছল চাতুরী, মিথ্যা প্রবঞ্চনায় ভরপুর। কে কাকে ঠকাবে, কে কাকে মারবে, কে কার উপরে টেক্কা দেবে, এই তো চলছে চারিদিকে। তাই বলছি, আর ভাল লাগছে না। যেদিকে তাকাও, সেদিকেই এই। **সাময়িক প্রশংসা অর্জন করার জন্য, যশ মান প্রতিষ্ঠার জন্য অগণিত অপরাধ স্তূপাকার করে ফেলছে। চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে, সবই বুঝতে পারছে, জানতে পারছে। কিন্তু ভয়ে আতঙ্কে কেউ কিছু বলতে পারছে না।** সবাই বুঝলেও যদি পিছনে শান্তি আসতো, পরমানন্দের সুর বাজতো, তবে প্রতিটি

বিষয়বস্তুকেই না হয় তারিফ করা যেত। কিন্তু প্রতিমুহূর্ত্তে দেখতে পাচ্ছ অসুস্থতায় ঘিরে ধরছে, ভাল ভাল মানুষগুলো ষ্ট্রোক হয়ে চিরবিদায় নিচ্ছে, কোনরকম কোন নির্দিষ্ট কিছু নেই— এখানে সবই অনিশ্চিত। তুমি চলেছ এক অনির্দিষ্টের পথে। সাতদিন পরে তোমার মৃত্যু হ'তে পারে, তুমি জান না। এদিকে সুখের নীড় গড়ে তোলার জন্য প্রাসাদের ভিত তৈরী করতে শুরু করেছ। যেখানে একমুহূর্ত্তের বিশ্বাস নেই, কোন বিষয়ে নির্দিষ্ট কিছু জানা নেই, সেই দেশে কেউ বসবাস করুক, আমি সেটা চাই না। কিন্তু এমনই হাজতে পড়ে আছি যে, তেমন দেশেই বসবাস করতে হচ্ছে। আগেই বলেছি, এখানে কোন কিছুতে নির্দিষ্ট কিছু নেই। কেউ কিছু জানে না। কেন এসেছে এই পৃথিবীতে জানে না। কার কখন মৃত্যু হবে, জানে না। মৃত্যুর পরে কোথায় থাকবে, জানে না। পাশ ফেল জানে না। কোন কিছুই যাদের জানা নেই, তারা জানে কিরকম জান? তারা অন্যায় করে, অপরাধ করে জানে, খুন করে জানে। তাদের জানা জোর জুলুমের জানা। **এমন এক্সরে যন্ত্র শীঘ্রই বের হবে, যে যন্ত্র দিয়ে দেখা যাবে আমাদের ভিতরের দানবীয় চেহারা। এতদিন এক্সরেতে বেড়িয়েছে শরীরের ভিতরের অস্থিময় রূপ। তখন দেখা যাবে মনের ভিতরকার দানবীয় চেহারা অর্থাৎ আমরা কতটা নীচে নেমে রয়েছি, ঐ যন্ত্রে ভিতরকার সেই চেহারাগুলো ফুটে উঠবে।** এই চেহারা দেখে যখন বিচার করবে, কেউ কারও সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চাইবে না। বাপ ডাকাত হলেও ছেলে ডাকাত হোক, বাপ তা চায় না। সে যথাসাধ্য ছেলেকে লেখাপড়া শেখায়। ঐ এক্সরে যন্ত্রে যে এক্সরে করবে, তারও দানবের চেহারা। আবার যাদের এক্সরে করবে, তাদেরও দানবের চেহারা। সব পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠবে। তাই কেউ কারও ছেলের সাথে কারও মেয়ের বিবাহ সম্পর্ক স্থাপন করতে চাইবে না। সেই দিন যে কবে আসবে, যেদিন আমাদের অন্তরের রূপ ধরা পড়বে সবার মাঝে। সেইদিনের প্রতীক্ষায় রয়েছি। সময় তো চলে যাচ্ছে। বিপদ ঘণ্টি বেজে গেছে। আর তো সময় নেই। সাংবাদিক, তাই বলি বারে বারে, কেন বলি? ভাল লাগছে না।

কোন কাজই ভাল লাগে না। একটা বিষয়ও পাচ্ছি না, যেটা ভাল লাগে। যে কাজে হাত দিতে চাই, তার মধ্যেই অপরাধে ভরা। এই অপরাধের

প্যানাগুলো থেকে মুক্তি পেতে হ'লে কিভাবে চলা উচিত, সাংবাদিক, সেটাই সর্বাগ্রে জানা উচিত। প্রকৃতির ধারাপাতার ধারায় সব ছেড়ে দিয়ে বসে আছে আমাদের উপরে। প্রকৃতিরই নীতি 'বাঁচ আর বাঁচাও' নীতি। সেই নীতি অনুসরণ করে নিজে বাঁচার সাথে সাথে অপরকেও বাঁচতে সাহায্য করা উচিত। কিন্তু তার পরিবর্ত্তে যে লীলা, যে রহস্য চলেছে সমাজের বুকে, কেউ টিকতে পারবে না। আর নিজেকে সৎ বলে, বড়াই করতেও পারবে না। **'সৎ' আর 'নিষ্ঠার' যে সংজ্ঞা, সেই সংজ্ঞার মধ্যে আমরা পড়ি কি না, নিজেরাই চিন্তা করে দেখ। জীবনের প্রতি স্তরে স্তরে প্রতিটি অণুতে পরমাণুতে ঘিরে রয়েছে এক অভিশপ্ত জীবনের ধারাপাতা।** এর ফলাফল ভবিষ্যতে কি হবে? সাংবাদিক, এর ফলাফল চিন্তা করেছ কি? নিজেদের সুখ সুবিধার জন্য মানুষ এত অপরাধ করে বেড়াচ্ছে, চিন্তা করা যায় না। **কেউ কেউ নিজের পক্ষে যাতে সুবিধা হয়, তারজন্য বলে বেড়াচ্ছে, 'এই জীবন এখানেই শেষ।' সুতরাং তার স্বকৃত অপরাধগুলো যেন আপত্তিমূলক নয়। কারণ সব কিছু এখানেই শেষ। সুতরাং যা করার করে নাও।** সে সেইভাবেই ব্যাখ্যা দিচ্ছে। সাংবাদিক, মনে রেখো, এটা কিন্তু অন্তরের ব্যাখ্যা নয়, কাজ হাসিলের ব্যাখ্যা। আবার কেউ কেউ বলছে, 'আমরা ফলাফল বুঝি না, প্রকৃতির রহস্য চিন্তা করতে পারি না। সামনে যা পাচ্ছি, সামনে যা দেখছি, তাই করে যাচ্ছি।' কিন্তু সাংবাদিক, আমরা যাই করি না কেন, না বুঝে কিন্তু করছি না। শিশুরা যা করে, অনেকসময় না বুঝেই করে। কারণ আগেই যে বললাম, একটি শিশু কার্নিসের একেবারে ধারে গিয়ে বসেছিল। বুঝ থাকলে কি কার্নিসে বসে থাকতে পারে? আমরা যদি শিশুর মত অবুঝ হয়ে অপরাধগুলো করতাম, তবে মনে হয়, অপরাধের বোঝা থেকে অনেকটা হাল্কা থাকতাম। কিন্তু সাংবাদিক, উপায় নাই। যা কিছু অপরাধ করছো, সব বুঝে শুনে করছো। এর হাত থেকে তো রেহাই পাবে না। **একটা পাখী যে অপরাধ করছে, সেও বুঝে শুনে করছে। একটা বিড়াল, একটা কুকুর যে অপরাধ করছে, বুঝে শুনেই করছে। জগৎবাসী যে যা কিছু অপরাধ করছে, প্রত্যেকে বুঝেই করছে। শিশুর বেলা সমূহ মাপ হ'তে পারে। কিন্তু বুঝ যখনই গজিয়ে উঠলো, তখন যদি কোন অপরাধ করা হয়, তবে বুঝদার হয়েই সে করলো। তাই বুঝে যে অপরাধ**

করলো, আর না বুঝে যে অপরাধ করছে, উভয়ের মধ্যে পার্থক্য থাকবেই। অপরাধের বোঝা জমতে জমতে পাহাড় সমতুল্য হয়ে গেছে। চারিদিকে অন্যায়, দুর্নীতি, অবিচার আর ব্যভিচারে দেশ ভরে গেছে। প্রতি কাজে হাজার হাজার মানুষের মুখে শুধু একটি কথা, 'বাবা, আর পারছি না। ভাল লাগছে না।'

সাংবাদিক, বলতে পার কেন? কেন মানুষের এত দুঃখ? দিশেহারা পথিক, পথহারা পথিক এইভাবে দুর্দশার পাঁকে পড়ে ভুলই করে যাচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে হাজার জনে হাজার রকমের ব্যাখ্যা করে বুঝাবার চেষ্টা করছে। সব ব্যাখ্যাই আমরা শুনবো। কিন্তু সাংবাদিক, মনে রেখো জিহ্বাটা তোমার। সেই জিহ্বায় যে স্বাদ দেওয়া হবে, সেই স্বাদ তুমিই পাবে, অন্যে বুঝতে পারবে না। আগেই বলেছি, ব্যাখ্যাকারীরা নানারকম ব্যাখ্যা করবে, কিন্তু সঠিক ব্যাখ্যার সুরটি যখন আসবে, তোমার ভিতরের জিহ্বায় ঠিক তার সাড়া মিলবে। ব্যাখ্যাকারীদের বিভিন্ন প্রকার ব্যাখ্যার মধ্যে নিজেদের স্বার্থ জড়িত থাকতে পারে। কিন্তু যাই জড়িত থাকুক,ব্যাখ্যা যখন স্বচ্ছ সুন্দর গতিতে যুক্তির পথে আসবে, সেই ব্যাখ্যা সবাই গ্রহণ করবে, সেই স্বাদ সবাই অনুভব করবে। তার মধ্যে কোন দ্বিধা-সঙ্কোচ থাকবে না। যেই ব্যাখ্যা আর 'উবাচ'তে 'শুনেছি' বা 'অমুকে বলেছেন' বলে জানানো হয়, যিনি বলেছেন, 'হয়তো তিনি একজন বিরাট ব্যক্তি' কিন্তু তা দিয়ে ব্যাখ্যার সঠিকতা বিচার করা চলে না। তাই তো বলেছি, তোমার স্বাদ তুমিই উপলব্ধি করবে, তবেই সেই স্বাদের মর্ম অনুধাবন করতে পারবে। বুঝলে তো? এইভাবে মেনে নিলে আজ পৃথিবীর ইতিহাসে এত গ্রন্থের প্রয়োজন হতো না। আসল বস্তু খুঁজে পায়নি বলেই এত গ্রন্থ, এত কথা। খুঁজে পেলে হ'তো একটি মাত্র কথা। দু'কথার আর প্রয়োজন হ'তো না। নিজেরা খুঁজে পায়নি, তাই অনেকে দেখাতে চেয়েছে, 'আমরা পেয়েছি বা বুঝেছি।' তারা আরও বলেছে, 'আমরা সুর পেয়েছি, সাড়া পেয়েছি, দর্শন পেয়েছি।' এই দর্শনের কথা বোঝাতে গিয়ে আরও গোলক ধাঁধায় পড়ে গেছে। এত বেশী দেখাতে গেছে যে, গল্পের সেই গোলক ধামে আর পৌঁছতে পারলো না। কেউ যে কোনদিন পৌঁছবে, তার সঠিক হদিশও দিতে পারলো না। কাউকে আমরা অবিশ্বাস করতে চাই না। আমরা শুধু জানতে চাই, ভাল লাগার কোন্

পথ? সেই সুপথ সেই ধারা আজকের সমাজে কেন ব্যবহৃত হচ্ছে না? দুধ খেলে শরীর সুস্থ হয়, শরীরে শক্তি বাড়ে। কিন্তু সেই দুধ যদি বদহজম হয়ে যায়, তাহলে অত্যন্ত ক্ষতিকারক হয়। আমরা ভাল থাকতে চাই, ভাল লাগাতে চাই, ভালবাসতে চাই। শুধু হিতোপদেশে হবে না। আমাদের এই কটি কথা শুনে নিয়ে প্র্যাক্‌টিক্যাল ক্ষেত্রে যদি কেহ সঠিক পথের সন্ধান দিতে পারতো, তবে বহু আগেই ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর সামাজিক অবস্থা অনেক সুন্দর হয়ে যেত। কেন হল না? কেন হচ্ছে না? এখনও এত রকমের সমস্যা কেন? এতবছর ধরে নিজের নিজের দেশের আভ্যন্তরীণ সমস্যার সমাধানই যারা করতে পারলো না, তাদের আবার গ্রন্থ। **এত গ্রন্থ, এত দর্শন বেশীরভাগই নাম কেনার জন্য, নিজেদের যশ ও মতবাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য। আমি এমন গ্রন্থ চাইনি। আমি চেয়েছি সেই গ্রন্থ, যে গ্রন্থ হবে দর্পণের মত এবং যার মাধ্যমে প্রত্যেকে নিজের নিজের মুখ দেখতে পাবে। কোথায় সেই গ্রন্থ?** তার রচয়িতা কে? তার গুরুত্ব কে দেবে? সাময়িক গুরুত্ব দিয়ে গ্রন্থ হয় না। এই গ্রন্থের গুরুত্ব এত, সেই গ্রন্থের গুরুত্ব তত, সেই আদর্শের গুরুত্ব অনেক— এসব কথা দিয়ে ভাল লাগার দিকটা খুঁজে পাওয়া যায় না। ভাল লাগার দিকটা চন্দ্র সূর্যের মত সবাই স্বীকার করে নেবে। সূর্য, চন্দ্র, আকাশ, বাতাস, জল, মাটি— প্রকৃতির এই বিষয়বস্তুর মাঝে, স্বচ্ছভাবের ভিতর দিয়ে তোমাদের ভাল লাগার বিষয়বস্তু কোথায় লুকিয়ে আছে, খুঁজে বের করতে হবে। আজ পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসে কত অগণিত ঘটনা ঘটে গেছে, অশ্রদ্ধা কাউকে করি না। কিন্তু স্বাদের দিক থেকে কোন সাড়া পাচ্ছি না, আমি শুধু এইটুকুই বলতে চাই। নিমন্ত্রণ বাড়ীতে আহারের পরে একটু মুখশুদ্ধি দেওয়া হয়। মুখশুদ্ধি কেন? আহারের পরে মুখশুদ্ধি খেলে মনে হয়, একটু ভাল কিছু খেলাম। কিন্তু কাউকে আহারের নিমন্ত্রণ করে এক থালা এলাচ, লবঙ্গ আর এক গ্লাস জল দিয়ে নিমন্ত্রণের ব্যবস্থা করা হয় না। এটা শুনতে যেমন হাস্যকর লাগে, আজকের সমাজে পৃথিবীর যত গ্রন্থ, যত বাণী আমাদের কাছে তেমনই লাগছে। কত কত গ্রন্থ ছাপানো হয়। ছাপার অক্ষরে মানুষ সেগুলি পাঠ করে রসাস্বাদন করে। ভাষা, ব্যাকরণ, শব্দ-সম্ভার, ছন্দ, মাধুর্য ও গাম্ভীর্যের দিক থেকে একেকটি অতুলনীয়, সন্দেহ নেই। কিন্তু মূলতঃ কি দেখতে পাচ্ছি? খাবারের

থালায় এলাচ, লবঙ্গ ছাড়া আর কিছু নেই, তা দিয়ে কি পেট ভরবে? **গ্রন্থের মাঝে সঠিক পথের সন্ধান যদি থাকতো, তাহলে পৃথিবীর ইতিহাসের ধারা বদলে যেত। অভাব, অভিযোগ, নির্যাতন, খুন, রাহাজানি সব বন্ধ হয়ে শোষণমুক্ত সমাজ গঠিত হতো। সাম্যবাদের ধারা সর্বত্র বিরাজমান থাকতো।** কিন্তু তাতো হ'ল না। মানুষ আজ সর্বদিকে বঞ্চিত হ'ল। এখন প্রায় সর্বক্ষেত্রেই চলছে লুণ্ঠন আর অসম বণ্টন। এই কি পৃথিবীর ইতিহাসের গ্রন্থ? যারা চলে গেছেন এই পৃথিবী থেকে, তাদের মাঝে অনেক শাস্ত্রজ্ঞ, বিচক্ষণ ও বিশ্লেষণকারী ছিলেন। তাদের জানাই শ্রদ্ধা। কিন্তু দুঃখের বিষয় পরিবেশনকারীর ত্রুটিতে কারও কিছুই খাওয়া হ'ল না। আজকের পৃথিবী যেন এক উন্মত্ততায় ভরপুর। সমাজ আজ উচ্ছন্নের পথে। আগেই বলেছি, প্রত্যেককে এক্সরে করলে ধরা পড়বে তাদের স্বরূপ। **আমরা প্রকৃত পথের সন্ধান চাই। তারই পথিক হতে চাই। আমরা সত্যভ্রষ্ট হতে চাই না। চন্দ্র সূর্যের মত স্বচ্ছ পবিত্র মন নিয়ে এগিয়ে যেতে চাই। বিপ্লব যদি আনতে হয়, এই পথেই বিপ্লব আসবে।** কি বল সাংবাদিক?

প্রশ্নকারী— আজ্ঞে, আপনার এই মধুর বাণী যত শুনছি, আরও শুনতে ইচ্ছে করছে। আপনি কৃপা করে আরও বলুন।

ঠাকুর— আজ আর সময় নেই। আরেকদিন এসো।

প্রশ্নকারী— সবার পথ আপনি বুঝতে পেরেছেন। কোথায় কোথায় ত্রুটি তাও ধরতে পেরেছেন। আপনি নিজেই একটা পথের সন্ধান দিন না?

ঠাকুর— সাংবাদিক, আর বারুদ দিও না।

প্রশ্নকারী— আজ্ঞে, আজকের সমাজের এই সঙ্কটজনক অবস্থায় আপনিই একমাত্র পথ দেখাতে পারেন, প্রকৃত পথের সন্ধান দিতে পারেন।

ঠাকুর— পথ আমি দিতে পারি না। আমি কি পথ দেব? শুধু মতটা জানাবার চেষ্টা করতে পারি। যা সত্য, যা ঘটনা, সবার সামনে তুলে ধরতে পারি, এইটুকু পর্য্যন্ত। এছাড়া আর কি দেব? আমাকে আর কিছু বলবে না। যা চলছে সমাজের বুকে, সেই সত্য ঘটনাগুলো সবার কাছে তুলে ধরবো। তাতে যদি বদলায় বদলাবে। না বদলালে রসাতলে ডুববে। ডুবতে তো চলেছেই।

বহুদিন আগে বলেছিলাম, প্রকৃতির উপরে মাঝে মাঝে রাগ হয়। কেন এই সৃষ্টি? তার থেকে যে সৃষ্টিগুলি হচ্ছে, তাতে তার কি ফায়দা? কি স্বার্থ? মাঝে মাঝে কেমন বিরূপতা এসে যায়। আবার ক্ষণে ক্ষণে ভাবিয়ে তোলে, এই দেহযন্ত্রে প্রকৃতির দান অপরিসীম। তাতে দর্শন, স্পর্শন, শ্রবণ, ঘ্রাণ, ভাল-মন্দ বুঝবার ক্ষমতা, এই বিশেষ শক্তিগুলি তো আছে। এই বুঝগুলির সাহায্যেই নিজ নিজ ত্রুটি-বিচ্যুতি ভাববার মতন অবস্থাও আছে। সবচেয়ে বড় কথা আমাদের দৃষ্টির সম্মুখে রয়েছে মৃত্যু। এই মৃত্যুর দৃষ্টান্তের কাছে সমস্ত অহমিকাই ম্লান হয়ে যায়। প্রায় প্রত্যেকের জীবনেই একটা বয়স আসে, যখন মৃত্যু চিন্তায় কাহিল করে ফেলবে। কোনকিছুই আর ভাল লাগবে না। সব সময় মৃত্যু চিন্তা। এই চিন্তা থেকে অনেকে দূরে থাকতে চায়, ভুলে থাকতে চায়। কিন্তু ভুলে থাকা যায় না। বুঝলে সাংবাদিক, আর তো কিছু না। মৃত্যুর এই দৃষ্টান্ত সামনে রেখে আমরা শুধু একথাই ভাবতে পারি যে, এই পৃথিবীতে আমরা সাময়িক বসবাস করতে এসেছি। এখানে কোন কিছুই আমাদের গ্রহণযোগ্য নেই, সব সাময়িক। এক বিন্দু জলও ধরে রাখার ক্ষমতা নেই। কিন্তু আমরা বেকুবের মত 'এটা আমার', 'সেটা আমার,' বলে হাতড়িয়ে চলেছি। প্রকৃতির বিচারে এটা আমরা বুঝে নিয়েছি। সেই ক্ষেত্রে আমরা কেন ত্রুটি-বিচ্যুতি করতে যাব? প্রকৃতির গণিতের গণনায় যা যা আছে প্রতিটি জীবের মাঝে, তার মধ্যে হাত বাড়িয়ে আমরা গণনায় ভুল করছি কেন? প্রকৃতির গণিতের গণনায় আছে যোগ, বিয়োগ পূরণ ও ভাগ। আমরা সাধারণভাবে এই অঙ্ক কষতে যদি ভুল করে ফেলি, আমাদের আবার সেটা ভাল করে শিখে নেওয়া উচিত। যেখানে যোগের প্রয়োজন, সেখানে যোগটাই করা উচিত। যেখানে বিয়োগ, সেখানে বাদ দিয়ে দেওয়া উচিত। যেখানে যেখানে ভাগ করতে হবে, সেখানে ভাগ করা উচিত। আর পূরণের স্থানে পূর্ণ করে, সেইভাবেই পূরণ করে নেওয়া উচিত। আবার যেখানে যেখানে ফ্র্যাক্শন্ করা আবশ্যক, সেখানে কাটাকাটি করে যে ফলটি পাওয়া গেল, সেই ফলটি নিয়েই চলা উচিত। আমরা যদি জীবনযাত্রার পথে, চলার পথে এই ফর্মূলাটা নিয়ে চলি, তবে অনেকটা পথ এগিয়ে যেতে পারবো।

পাহাড়ের গায়ে এমন বিপদসঙ্কুল সঙ্কীর্ণ পথ আছে, যেখানে দুটি

পা একত্রে রাখার জায়গা থাকে না। অত্যন্ত সন্তর্পণে ধীরে ধীরে সেই পথে চলতে হয়। একটু অন্যমনস্ক হলেই পা পিছলিয়ে ৩ মাইল নীচে পড়ে যাবে। আর পাহাড়ের খাদে একবার পড়ে গেলে অবধারিত মৃত্যু। ঐ পথ দিয়েও তো অত্যন্ত সন্তর্পণে আস্তে আস্তে হেঁটে পার হ'তে হয়েছে। দীর্ঘপথ এইভাবে অতিক্রম করেছি। **আমাদের জীবনের চলার পথও এমন কুয়াশাচ্ছন্ন যে, যদি অন্যমনস্ক হয়ে পথ চলা যায়, তবে পিছলিয়ে বহু নীচে চলে যেতে হবে। ঐ পথ দিয়ে যারা আস্তে আস্তে সতর্ক হয়ে চলতে শিখবে, তারাই খুঁজে পাবে সেই পথের সন্ধান।** ইহা ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাচ্ছি না। আর ঐ গণিতের ফর্মূলা যোগ, বিয়োগ, পূরণ ভাগ— এটা ঠিক রাখতে হবে। বুঝলে সাংবাদিক, একটা সাধারণ কথা বললাম। আগে এগুলি রক্ষা কর। তার পরবর্ত্তী অধ্যায়ের কথা তার পরেই জানতে পারবে। আগেই যদি লাফিয়ে লাফিয়ে জানতে চাও আর গোল টেবিলে বসে তর্ক বিতর্কে শেষ করো, তবে সেরকমভাবেই উত্তর পাবে। আসল পথের সন্ধান আর পাবে না। তাই বলি, 'সাধু হও সাবধান।'

প্রকৃতির ইতিহাসের খাতায় পাতায় কোন নিয়ম, কোন কিছুই বুঝে উঠতে পারছি না। যতটা রয়েছে আমাদের বুঝের ভিতরে, তাতে শুধু এটুকুই বুঝতে পারছি, প্রকৃতির গণিতে রয়েছে সাতটি ফর্মূলা। এ বিষয়ে পরে বলবো বিশদভাবে। জীবনের পথে চলতে চলতে সাধারণ দৃষ্টিতে সমূহ এটাই দেখতে পাচ্ছি, 'আর ভাল লাগছে না।' কেন লাগছে না? শুধু এটুকুই বলতে পারি, সৃষ্টির চারিদিকে তাকিয়ে আর ভাল লাগছে না।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

তোমাদের অন্তরের কাছে আমি ব্ল্যাঙ্ক পেপারে সই রেখেছি। ঐ সাদা কাগজে যেন দাগ না পড়ে। সেটা দেখা তোমাদের কর্ত্তব্য

১৪ই এপ্রিল, ১৯৬৮
১৫৫ পার্কষ্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০০১৬

আজ থেকে প্রায় ৪০ বছর আগে, তখন আমরা ত্রিপুরা ডিষ্টিক্টে ছিলাম। তখন আমার বয়স ৭/৮ বছর হবে। নববর্ষে বেশ বড় মেলা হয় সেখানে। বাবা সেখানে কাজ করতেন। নায়েবরা আমাদের চার আনা করে পয়সা দিত।তাতে এক টাকা, পাঁচ সিকে হতো। সেই মেলার এক জায়গায় জুয়া খেলা হতো পয়সা দিয়ে। কতগুলো ঘরকাটা আছে। একেক ঘরে একক রকমের জিনিস আছে। জিনিসগুলোর নাম এলোমেলোভাবে অন্য জায়গায় লিখে দেওয়া আছে। তোমাকে ঘরগুলোতে ঘুঁটি ফেলতে হবে। আর যে ঘরে ঘুঁটি ফেলেছ, সেই ঘরে কি জিনিস আছে, বলতে হবে। মিলে গেলে অর্থাৎ ঠিক ঠিক বলতে পারলে, পয়সা পাবে। আমাকে দেখে বাবা বলছেন, 'তুমি খেলবে?'

আমি বললাম, হ্যাঁ।

—'আচ্ছা খেল', বাবা বললেন। একটা প্রবাদ আছে, ওখানে খেললে মঙ্গল হয়। আমি যেই গেছি, সবাই তাকিয়ে আছে, আমি কোন্ ঘরে ঘুঁটি ফেলবো। দেখতে দেখতে অনেক লোক জমা হলো। তারা বলছে, ''এই ঠাকুর যেটায় ফেলবে, সেটা হতে জিতে যাবে।'' আমি বলি, ''আমি খেলবো না। আমি জানি, কোন্ ঘরে কি আছে।'' এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসছে। সাথে সাথে জুয়ার লোকগুলি এসেছে। একজন বলছে, ''বাবু, আমাকে বাঁচান। আমার সব গেছে।''

আমি বলি, ''আমি তোর টাকা নিলাম কোথায়?'' সে বলে, ''গোঁসাই,

আমি হেরে গেছি। তুমি খেল।'' আমি বলি, ''আমি খেলবো না। আচ্ছা যা, তুই খেল। এবার জিতবি।''

সে জিতলো। জিতে সমান সমান হয়ে গেছে। হারজিত সমানই রইলো।

পাশে তিতাস নদীর উপর দিয়ে একটা মরা ভেসে যাচ্ছিল। তার উপর কাক বসে আছে।

আমি বলি, ''এই লোকটা জলে ডুবে মারা গেছে। একে খুঁজে পাচ্ছে না। ইচ্ছে করে মরে গেছে।'' একজন লোক বলছে, ''এই লোকটা রাধানগরের। ডুবে মারা গেছে।'' তার স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে আমার কাছে এসেছে। স্বামীকে খুঁজতে বেরিয়েছে। সবাই আমার কথা বলে দিয়েছে, ''এঁর কাছে যাও।''

নববর্ষের দিনই স্ত্রী বলছে, ''কালরাত্রে ঝগড়া হয়েছে।'' আমি বলি, ''হ্যাঁ, একটা কাকও দেখলাম মরার উপর। এখনওতো পচে নাই। তবে কেন কাক বসে আছে? দেহটা স্বাভাবিকভাবেই রয়েছে। বিকৃত হয় নাই, যেন ঘুমাচ্ছে।''

স্ত্রী বলে, ''বাবা, ঝগড়াঝাটি করে গেছে। একটা কথাও বলে যেতে পারে নাই।''

আমি বলি, ''মরা মানুষ কি কথা কয়?''

—বাবা, একটা কথা বলবো ওর সাথে।

আমি বলি, ''আচ্ছা, যদি কিছু বলার থাকে, বল না''?

আমার লগে (সাথে) যারা ছিল, পিছপা দিচ্ছে। এমনি মরা দেখলে ভয় পায়। তারপরে জলে ডুবে মরেছে। আবার নাকি কথা বলবে। স্ত্রী স্বামীর কাছে গিয়ে বলছে, ''কই গো, কই গো ওঠ ওঠ।'' তাতে নড়েচড়ে উঠেছে।

আমাকে বলছে, ''বাবা, নড়ে উঠেছে।''

আমি বলি, ''না, নড়ে নাই। এদিক ওদিক করছে।'' আমি ধুলাবালি ছিটিয়ে দিলাম। তারপর বলি, ''কথা ক (বল)।''

লোকটি দু'চারটি কথাবার্ত্তা বলেছে, ''আমি আর বাঁচবো না। আমি মরে গেছি।''

তাতেই স্ত্রী এসে বলছে, ''বাবা, এতো বাঁচা আছে।'' তারপর আমার পায়ে পড়েছে, ''বাবা, ওতো কথা বলেছে। তুমি বাঁচিয়ে দাও''।

যতগুলি লোক মেলায় ছিল, শুনতে পেয়েছে, জলে ডোবা মরাটা কথা বলেছে।

আমি বাসায় এসেছি। লোকটার স্ত্রীও এসেছে। আর বলছে, মরা দেহটা নিয়ে আসবে বাসায়।

আমি বলছি, ''তা নয়। বরং ভাসিয়ে টাসিয়ে দাও।''

পরে দেখে, স্বামী ওদিকে রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। দেখে ভয় পেয়ে চিৎকার দিয়েছে। আমাকে এসে বলছে, ''বাবা, দেখে এলাম ঘাটে। তারপর দেখি মাঠে। আমার ভয় করছে। তুমি আমায় পাঠিয়ে দাও বাসায়।''

আমি বলি, ''দেখছো তো, ভালবাসার দৌড় তোমাদের কতটুকু। যাকে নিয়ে এতদিন ঘর করেছো, আজ কেমন ভয় পাচ্ছ।''

ঐ যে আত্মা, নববর্ষে জলে ডুবে মরা লোকটার আত্মা আবার অন্যদিকে উপদ্রব শুরু করেছে। 'ও' যে মরে গেছে, তার বন্ধু হরিপদ, আমারই শিষ্য, জানে না। হরিপদকে দেখে বলে, ''হরিপদ কোথায় যাচ্ছ? আমার সঙ্গে চলো।'' হরিপদ কেমনে বুঝবে, লোকটা মারা গেছে। একটা কবরের সামনে হরিপদকে নিয়ে গেছে। তার সাথে কথা বলছে, ''দেখ ভাই, আমরা দুজনে একরকম হয়ে যাই'', বলেই হাত লম্বা করে উপরের দিকে দেখাচ্ছে। আত্মা ইলাস্টিকের মত লম্বা হয়ে যায়। যতটা পারে, এইরকম লম্বা হয়ে গেছে।

হরিপদর সন্দেহ হওয়াতে বলে, ''দেখ, আমি একটু জল খেয়ে আসি''। তারপর এক গৃহস্থ বাড়ীতে গিয়ে বলে, ''আমাকে বাঁচাও।'' গৃহস্থ সব শুনে বলছে, ''এতো কয়েকদিন আগে জলে ডুবে মারা গেছে''।

হরিপদ আঁ করে ফেইন্ট (অজ্ঞান) হয়ে গেছে। তারপর জ্ঞান ফিরলে বলছে, ''আমাকে এই গ্রাম থেকে বার করে দাও।''

হরিপদ সাধু প্রকৃতির লোক ছিল। কাঁদতে কাঁদতে আমার কাছে

এসে বলছে, ''ওর স্ত্রী আর স্বামীকে চায় না। ঘরে যে স্বামীর ফটো রয়েছে, ভয় ধরে গেছে, ফটো হতে যেন নেবে না আসে।'' কি অবস্থা দেখ।

এই তিন চার দিন আগে মেটেবুরুজের একজন এসেছে। তার স্বামী মারা গেছে পক্সে। আমাকে বলেছে, ''আমি স্বামীকে দেখবো। আপনি ব্যবস্থা করে দিন।''

আমি বলি, ''স্বামী কোথায় যে দেখবে?'' সে কিছুতেই শুনবে না। তখন বললাম, ''আচ্ছা, একটা বস্তু দেব। যদি হয়, এতেই হবে। বস্তুটা যদি পড়ে না যায়, তাহলে স্বামীর দেখা পাবে। আসলে তো ভাল কথা''। গৌরীশঙ্কর দিয়েছে। বস্তুটা পড়ে গেছে। তাতে আমার উপর চটে গেছে। গৌরীশঙ্করের উপর চোট নিয়েছে। বিগড়ে গেছে।

প্রত্যেকের আত্মাটা যে আছে, আত্মা থাকে কিভাবে? তোমরা যেমন ধোঁয়া দেখ, ধোঁয়ার একটা রূপ আছে, জানতো? দেখ না, অনেক বাজীতে আগুন দিলে, উপরে গিয়ে কেমন কৃষ্ণের মূর্ত্তি, রাধার মূর্ত্তি হয়ে যায়। ধোঁয়া হতে উপরে অদ্ভুতমূর্ত্তি (Shape) ধারণ করে। এই মূর্ত্তির নিজের উপর কোন অধিকার থাকে না। যে কোন অবস্থায় লম্বা হয়ে যায়। আমার নিজের কথাই বলি, ছোটবেলা যখন ত্রিপুরা জেলার কৃষ্ণনগরে থাকতাম, উজানচর কংসনারায়ণ হাইস্কুলে পড়তাম, অনেকেই অনেক বিভূতি দেখেছে। আশু সেন, ত্রৈলোক্যবাবু ও আরও মাষ্টারমশাইরা আসতেন। একটা ঘরে এসে বসতেন। আমি তাঁদের বলতাম, ''আমায় ধরে রাখুন।''

তাঁরা আমায় ধরে রাখতেন। আমি বডি রেখে চলে যেতাম। দেহটা পড়ে আছে। খানিকক্ষণ পরে এসে বাইরে থেকে বলতাম, ''জ্যাঠামশাই, দরজাটা খুলে দিন। ভয় করছে?''

—না। তুমি জানালা দিয়ে তো আসতে পার।

—হ্যাঁ, পারি। তবে দরজাটা খুলে দিন।

এই যে দেহটা ছেড়ে চলে যায় সাপের খোলসের ন্যায়, অদ্ভুত একটা জিনিস দেহ থেকে বের হয়ে যায়। সেই ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব, চৈতন্য সবকিছু নিয়ে বের হয়ে যায়। এখানে সাধনায় যদি প্রবিষ্ট থাকো, সাধনার বলে আত্মাকে যদি নিজের আয়ত্তে রাখতে পার, সেটাই সাধনার ক্ষমতা। আমি

যে এইভাবে চলে যেতাম, লক্ষ লক্ষ লোক জানে। পরে বন্ধ করে দিলাম। কেন বন্ধ করা হল? এতে আত্ম-অহঙ্কার হয়। এই ক্ষমতা ব্যবহার করলে নিন্দা-চর্চায় পড়তে পারি; লোককে দেখাবার জন্য এটা করছি, ভেবে মানুষ উপহাস করতে পারে, সেইজন্য বন্ধ করতে হল।

যখন আমায় লালবাজারে ধরে নিয়ে গেল, নানাভাবে অপমান করলো, তখন যদি ক্ষমতা দেখাবার ইচ্ছা হতো, তাহলে রেকর্ডে একটা ক্র্যাক পড়ে যেতো। তোমাদের বাবাকে নিয়ে কতরকম কথা শুনতে হয়েছে। কিন্তু আমি আমার পথ থেকে এতটুকু বিচ্যুত হইনি। মা তার নিজের স্তন কখনও নিজে পান করে না। দৈবের ক্ষমতা নিজের জন্য ব্যবহার করলেই ক্র্যাক পড়ে যাবে। সাধুরা সারা দেহে ছাই মাখে কেন? যাতে ক্র্যাক না পড়ে। তোমার সত্যিকারের সত্তাকে খুঁজে বের করো। দেহবীণাযন্ত্রের অন্তর্নিহিত শক্তির যাতে স্ফূরণ হয়, তার ঐকান্তিক প্রচেষ্টাই হ'ল সাধনা। **সাধনার দ্বারা অর্জিত ক্ষমতা, সে যেন সাপের মাথার মণি। সেই ক্ষমতার অপব্যবহার যাতে না হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। ক্ষমতা হ'ল, কোন জায়গায় গিয়ে তুমি আটক হয়ে আছ, সেই রুদ্ধ দ্বার খুলে মুক্ত করে দেওয়া।** সাধনার দ্বারা অর্জিত ক্ষমতাবলে বিভূতি দেখিয়ে যদি টাকা পয়সা উপার্জন করা হয়, এর চেয়ে পতন আর কিছু নেই। কোন মহানের স্ফূরণ হয়ে যদি পতন হয়, তবে আর উদ্ধার নেই। এর জাজ্জ্বল্যমান দৃষ্টান্ত নিজের কথা নিজে তোমাদের জানাচ্ছি। বাপের কথা বলেই সন্তানদের জানাতে হয়। তাই নববর্ষে নিজের কথা বলছি। শিশুবয়সে ''বাচ্চা ঠাকুর'কে দেখার জন্য অজস্র লোক মাঠে বসে থাকতো। তখন ক্ষমতার স্ফূরণ এত ছিল, খেলার ছলে কত অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিসের স্ফূরণ হতো, মানুষ আশ্চর্য হয়ে যেত। স্বতঃস্ফূর্তভাবে সেই ক্ষমতার প্রকাশে নিজের কোন ছোঁয়া যেন না লাগে, সেদিকে লক্ষ্য থাকতো। যদি নিজের স্বার্থের জন্য ক্ষমতার ব্যবহার হয়, তাহলেই পতন। ''ও আমার নিন্দা করছে? দেখায়ে দিমু (দেখিয়ে দেব)'', তাহলেই হয়ে গেল। সেজন্যই দেবর্ষি নারদ বলেছে, 'ফোঁস করবে, দংশন করবে না।'

কাজেই চেষ্টা করি, বুদ্ধি দিয়ে গুছাতে; যাতে আমার দৈব ক্ষমতার উপর আঁচড় না পড়ে। পৃথিবীর রাজা হতে পারে, কত তার ক্ষমতা। কিন্তু

শেষ বেলায় হরি বল ভাই। ৬০/৭০ বছরের আয়ুর জন্য রেকর্ডে ক্র্যাক পড়ার কোন মানে আছে? দেখ, বাবর, আকবর থেকে শুরু করে কোন সম্রাটই পৃথিবীর বুকে থেকে যায়নি। কেবল ইতিহাসে এদের নাম মুখস্থ করে পরীক্ষায় পাশের জন্য। কিছুই থাকে না। শুধু থেকে যায়, স্রষ্টার সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ স্থান নিয়ে যাঁরা জন্মগ্রহণ করেছে, প্রকৃতির সুরে সুরময় হয়ে যাঁরা কাজ করেছে। আমি ক্ষেতী, ক্ষেত্রে বীজ বপন করছি (দেহক্ষেত্রে দীক্ষামন্ত্র দান করছি)। আমি যাদের দীক্ষা দিয়েছি, তাদের সেই পরম গন্তব্য স্থলে পৌঁছিয়ে দেওয়া আমার কর্ত্তব্য। মা সব সহ্য করেন সন্তানের মুখের দিকে তাকিয়ে। আমাকে কেউ ভগবান বলছে। আবার কেউ শয়তানও বলছে। কে কি বললো, আমার তা দেখার দরকার নেই। **আমার কাজ, কি করে আমার সন্তানদের সেই জায়গায়, সেই পরম আনন্দময় ধামে নিয়ে ফেলবো। সেখানে গেলে তোমাদের আর এইসব ঝামেলা সহ্য করতে হবে না। যা জানলে আর জানার কিছু থাকে না, তারই ব্যবস্থা করা, জন্মসিদ্ধ মহানের কাজ।** মায়ের পেট থেকে পড়েই আমি মহাশূন্যের ধ্যান করছি। যখন আমার ৬/৭ বৎসর বয়স, জলের উপর দিয়ে হাঁটতাম। সবাই আশ্চর্য হয়ে যেতো। তখন থেকেই চিন্তা করতে আরম্ভ করলাম, কিভাবে সবাইকে নিয়ে যাওয়া যায়। কি করে মানুষকে এই দুঃখ কষ্টের হাত থেকে মুক্তি দেওয়া যায়। কিন্তু এমনি জায়গা, মানুষগুলো কি করে আবার জন্ম হয়, তারই চেষ্টা করছে। এই যে এ.সি. (কারেন্ট) থেকে ওকে ছাড়িয়ে নিয়ে আসি। আবার দেখি, নিজেই ধরে বসে আছে। জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে কিছুতেই রেহাই পাওয়া যায় না।

দৈবজ্ঞরা, জন্মগত মহানরা তখন এসে কি করেন? তাঁরা ধাঙরের কাজ, নোংরা পরিষ্কারের কাজ করতে নামেন। মূর্ত্তি যাঁরা গড়ায়, তাঁদের গায়ে কাদার ছিটা লাগে। নিন্দা, অপমান সবকিছু হাতে নিয়ে তাঁরা মূর্ত্তি গড়ার কাজ আরম্ভ করেন। ঐ যে বস্তু দেওয়া হল, বস্তুটা হাত হ'তে পড়ে গেল কেন? গৌরীশঙ্করের সাথে আমিও দোষের ভাগী হলাম। তখন বর্ষাকাল, গয়না নৌকা করে যাচ্ছি অনেক লোক। কাছাকাছি একটা ঘাটে আমার নামার প্রয়োজন ছিল। **মাঝিকে বললাম, নৌকা থামাতে। সে কিছুতেই থামাবে না। নৌকা নিয়ে সোজা চলে যাচ্ছে। আমি বললাম,**

"মাঝি, তুমি যে যাচ্ছ, দেখ, নৌকা কিন্তু ঘুরে যাবে।" মাঝি আমার কথায় কর্ণপাত করলো না। এদিকে নৌকা ঘুরতে শুরু করেছে। সবাই হৈ হৈ করে উঠেছে। আমি চুপ করে আছি। নৌকা ঘুরে গিয়ে চলতে শুরু করেছে। তারপর নির্দিষ্ট ঘাটে গিয়ে থেমে গেল। আমি আমার সঙ্গীদের নিয়ে নেমে গেলাম। পরে অবশ্য নৌকার গতি ঠিক করে দিয়েছিলাম। এই যে ব্যাপারটা, এটা অদ্ভুত কিছু নয়। দৈবের ক্ষমতার কাছে এটা কিছুই নয়।

যে শূন্য হতে এই সুন্দর জগৎ সৃষ্টি হয়েছে, সেই শূন্যের মাহাত্ম্য, শূন্যের ক্ষমতা নিয়েই আমি এসেছি। চোখের সামনে দেখছো যে, শূন্যমার্গ হতেই সব কিছুর সৃষ্টি হয়েছে। সেই ক্ষমতাতেই আমার ক্ষমতা। তার মধ্যে থেকেই আমাকে কাজ করতে হবে। এই দেহটা এমন একটা জিনিস যে, দেহটা পড়ে থাকে। মাখনের ন্যায় আত্মাটা চলে যায়। চলে গিয়ে শূন্যে ঘুরতে থাকে। পরে মনে হবে, ''ঠাকুর বলেছিলেন, আমরা উদ্ধার হয়ে যাব। এখন শূন্যমার্গে ঘুরছি।'' এই বুঝটাকে পাকা করাই আমার কাজ। দেখ, একটু বারুদের তেজে বুলেট দেড় মাইল, দুই মাইল পর্যন্ত যায়। এমনি দশ, বার হাত যায় মাত্র। প্রত্যেকের আত্মাতেই বারুদের মতো জিনিস রয়েছে। আগুন দিলে যেমন হাউই বাজী উপরে উঠে যায়, **আমার আশীর্বাদ, আমার প্রাণের স্পর্শ তোমাদের ভিতরে বারুদের ন্যায় ক্রিয়া করে। যখনই আত্মাটা দেহ থেকে বেরিয়ে যাবে, সেই ক্ষমতাবলে বারুদের ক্রিয়ার মতো আত্মাকে সাঁ করে টেনে নিয়ে যাবে। কোথায়? তোমাদের আত্মাকে টেনে জন্ম হওয়ার স্তরটাকে পার করে নিয়ে যাবে। যে পর্যন্ত জন্ম-মৃত্যু চক্রের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি আছে, তার বাইরে নিয়ে যাবে। তখন নিজের ইচ্ছায় স্বাধীনভাবে চলার ক্ষমতা তোমাদের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হবে।** জন্ম-মৃত্যুর স্তর অতিক্রম করে তোমরা চলে যাবে। ক্ষমতায় ভরপুর হলে, সেই বুঝ এলে গ্রহে গ্রহান্তরে যাতায়াত করতে পারবে।

দেখ, রামচন্দ্র এতবড়, এত বিরাট মহান হয়েও হনুমানকে ড়াকছেন। তিনি এমন একটি অবস্থায় ছিলেন যে, নিজের ক্ষমতা লুকিয়ে রেখেছিলেন। নিজেকে এমনভাবে প্রকাশ করতেন, যেন অতি সাধারণ। তা না হলে নর-বানরের সাহায্য ছাড়া সীতাকে উদ্ধার করতে পারতেন না? টাইটানিক জাহাজের ক্যাপ্টেন বাঁচতে পারতো নিজে। কিন্তু সেটা সে করলো না। যদি

তাঁর বাঁচবার ইচ্ছা জাগে, তাই সকলকে বাঁচানোর চেষ্টায়, নিজেকে তালা বন্ধ করে চাবিটা ফেলে দিয়ে স্বেচ্ছায় মৃত্যুকে বরণ করে নিল। **শ্রীরামচন্দ্র কি করলেন? তিনি নিজে যে এত বিরাট ভুলেই গিয়েছেন। এত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও সাধারণ সাধারণ জ্যোতিষীর কাছে গিয়ে হাত দেখাতেন। সাধারণ ব্রাহ্মণের কাছে গিয়ে হাত জোড় করতেন। কত বিরাট ক্ষমতা থাকলে নিজের ভগবৎসত্তা ভুলে গিয়ে এভাবে নিজেকে ভুলিয়ে রাখতে পারেন। এটা ক্ষমতার চরম অবস্থা।** হনুমান বলছে, ''তুমি ভগবান। তুমি নিজের হাত দেখাচ্ছ?'' কত বড় ক্ষমতা হলে নিজেকে ভুলে যাওয়া যায়। ক্ষমতার বৈশিষ্ট্য এটাই। **জন্মগত মহানরা জনকল্যাণে, জগতের কল্যাণে, সন্তানদের (দীক্ষিতদের) কল্যাণে মান, অপমান, নির্যাতন সব সহ্য করেন।**

এই জগতে ৬০/৭০, ৮০/৯০ বছরের খেলা মাত্র। ২০ বছরের লিজ দেওয়া গড়ের মাঠে ৪০ হাজার টাকা খরচ করে কে বাড়ী করবে? নববর্ষে তোমাদের ভুল-ভ্রান্তি সব কিছু ফেলে দিয়ে এমনভাবে চলা উচিত, যাতে গুরুর আদেশ নির্দেশ পালন করে চলতে পার। তোমরা এমন একটি অবস্থায় মিশতে চেষ্টা কর, যাতে ক্ষমতার সাথে যুক্ত হয়ে যাও। দেখ, এতবড় বিরাট সাগরের জলে কেহ তেষ্টা নিবারণ করতে পারে না। লবণাক্ত সাগরের উপরে লোক জল না খেয়ে মরে যায়। **দেবতারা নিজেকে এমন করে রাখে। সমস্ত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তাঁরা নিজেকে আড়াল দিয়ে রাখে। তোমাদের যখন ঐ ক্ষমতা আসবে, কোন অবস্থায় তার অপব্যবহার করবে না। তাই 'সাধু হও সাবধান।' ফণির যে মণি, তার এত মূল্য কেন? সেই মণি, সর্ব অবস্থায় তোমাদের মধ্যে যেন যুক্ত থাকে; ফণিতে যেন না পৌঁছায়।**

যে মণি নিয়ে তোমাদের কাছে এসেছি, যে মণি নিয়ে তোমাদের কাছে আছি, সেই মণির সঙ্গে প্রতিনিয়ত তোমাদের যুক্ত করছি। এই যোগাযোগে যুক্ত করেই যেন সেই চরম ও পরম স্থানে তোমাদের নিয়ে যেতে পারি। যে সহজ সরল শক্তি নিয়ে এসেছি, হ্যান করেঙ্গা, ত্যান করেঙ্গা— কোন অবস্থায়ই মনের মধ্যে আসে নাই। আমি যেন তোমাদের মণি দিয়ে পরমবস্তুর কাছে নিয়ে ফেলতে পারি। এই ইচ্ছা পূরণের জন্যই এত ঘাত-প্রতিঘাত সহ্য করছি। মেয়ের বিবাহ দেবার পর মা-বাবা দুজনেই

কাঁদে। তার অর্থ এই নয় যে, মেয়েকে বলছে, ''তুমি স্বামী ছেড়ে এসে পড়''। তোমরা যে গুরুনিন্দা, অপবাদ শোন, তাতে আমিও দুঃখ পাই। এখানকার মুখ উজ্জ্বল করতে যেন দৈব ক্ষমতার ব্যবহার না করি। এটা মুখ উজ্জ্বল নয়, মুখ পোড়ানো। এইরকম বড় হওয়ার জন্য নিজেকে কতগুলো ব্যাঙের মাঝে ছেড়ে দিতে রাজী নই। এই জগৎটা হলো ব্যাঙের হাট।

যে বিরাট শক্তি নিয়ে এসেছি, তোমাদের প্রতিদিনের চাওয়া পাওয়ার মাঝে তাকে সহজভাবে বিলিয়ে দিতে পারি না। তাহলেও বহু দেওয়া হচ্ছে। মাঝে মাঝে ক্ল্যাশ (Clash) লাগে কোথায়? একজন এসে বললো, ''স্বামী মারা গেছে, তাকে ফিরিয়ে দাও।'' না দিলেই বিগড়ে গেছে। এরূপ দাবী হলে মুস্কিলে পড়তে হয়। দেওয়া যে হয় না, তা নয়। আমি তাবিচ-কবচ দিই না, টাকা পয়সার সঙ্গে সম্পর্ক রাখি না। সাময়িক চাহিদাটা বেশীর ভাগই মিটানোর চেষ্টা করি। আমি তোমাদের ঘরের লোক। তোমাদের সঙ্গে যেন ভুল বুঝাবুঝি না হয়। যখন দেখি, একটা বিপদ আসছে, সেটা কাটাতে গেলে ১০০ জন্ম আরও বেশী দুর্ভোগ পোহাতে হবে, তখন ঘুরাই। ঘোরাতে দুঃখ লাগে, তাও ঘুরাতে হয়। কারণ আজ না হয় ওর চাহিদা পূরণ করলাম। পরে যখন 'ও' বুঝবে, আরও কত দুর্ভোগ ওর জন্য অপেক্ষা করছে, তখন আমাকে বলবে, ''কেন তুমি দিলে ঠিক করে? তুমি তো জানতে এর পরিণাম কি? কেন এটা করতে গেলে?'' তখন আমি কি জবাব দেব? নিজেদের মধ্যে যে আপদ বিপদ আছে, নিজেরা মিটিয়ে ফেলার চেষ্টা করবে।

নববর্ষ উপলক্ষ্যে ছাড়া ছাড়া কথা বলছি। আমার সঙ্গে প্রায় একই তারিখে কেস হ'ল, আমারই এক শিষ্যের— নাম নগেন সেন। ফাঁস হবার কথা, 'ও' ঠিকই খালাস হয়ে গেল। ওরে নববর্ষে আশীর্বাদ করেছি, ''পিতা-পুত্রের মধ্যে যেন কোনরকম ভুল বুঝাবুঝি না আসে''। এতটুকু বাচ্চা, ৪/৫ বছর বয়স হতে প্রকৃতির সুরে রয়েছি, আমার জেল অপবাদ কেন? যদি চাকরী বাকরী করতাম, সুখে থাকতে পারতাম। সব ছেড়ে দিয়ে এক মহান ব্রতে ব্রতী হয়েছি। আমাকে তোমরা দেখবে। তোমরা একটু ভুগবে, আমিও ভুগবো। আর খেয়াল রাখবে, আমি যেই উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছি, যে দৈব হতে এসেছি, সেই দৈবের সঙ্গে যেন তোমাদের যুক্ত করতে পারি।

হাজার হাজার সন্তানকে গাড়ীতে তুলছি কাঁধে করে। সেইরকম গাড়ী করেছি, যাতে তোমাদের সবাইকে নিয়ে সেই পরম গন্তব্যস্থানে পৌঁছাতে পারি। বগীর ইঞ্জিন হওয়ার দরকার হয় না। বগী শুধু ইঞ্জিনের সাথে যুক্ত থাকলেই হল। বিষ্ণু যেখানে বিরাজ করছেন, শিব যেখানে বিরাজ করছেন, সেখানে যেতে পারবে। তোমাদের সহস্রার লোকের টিকিট কাটা আছে। বিষ্ণুর সঙ্গে দেখা হবে। সেই টিকিট তোমাদের কেটে দিয়েছি। তবে গাড়ীতে উঠতে যেন ভুল না হয়। সাময়িক ভুলে, কানকথায় যেন ভুল বুঝাবুঝি না হয়। তাই বলি, 'সাধু হও সাবধান।'

পিতা-পুত্রের মিলনটাই সবচেয়ে বড়ো। লব-কুশের সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের মিলন হয়েছিল। তার আগে লব-কুশের সঙ্গে যুদ্ধ হয়েছিল। আমাদের মিলন সুরের জন্যই এই কীর্ত্তন। আমাদের দৈনন্দিন জীবনের যতকিছু পাপ হরি হরণ করছেন। হরির নামে সব পাপ মুছে যায়। হরির নামে সব পাপ হরণ করে, হরি মহাকাশে মিলিয়ে দিয়েছেন।

নববর্ষে তোমাদের জন্য যে প্রীতি ভালবাসা নিয়ে এসেছি, এই ভালবাসা শুধু আজকের জন্যই নয়, চিরযুগ যেন থাকে। চিরদিনের জন্য থাকবে। **তোমরা নিশ্চিন্ত মনে এই একটি ব্যক্তির কাছে এসে অনায়াসে সব বলবে। 'এ' এমন একটি দর্পণ— এখানে সহজসরল মনে সব বলবে। ভুল-ত্রুটি করি, আমি খুলে বলবো। দেখ, তোমাদের অন্তরের কাছে, সকলের কাছে আমি ব্ল্যাঙ্ক পেপারে সই রেখেছি। ঐ সাদা কাগজে যেন দাগ না পড়ে। ওটা স্বচ্ছ। এই স্বচ্ছতা বজায় রাখা বা কাগজে যেন দাগ না পড়ে, সেটা দেখা তোমাদের কর্ত্তব্য। সেই দায়িত্ব তোমাদের উপর ছেড়ে দিলাম।** তোমরা কোন অবস্থাতে বিভ্রান্ত হবে না। হতাশায় ভেঙে পড়বে না। সব সময় সাবধানে থাকবে। তাইতো বলি, 'সাধু হও সাবধান'। আজ এই থাক।

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

-ঃ প্রাপ্তিস্থান ঃ-

১) কৃষ্ণা, S.T.D. বুথ, বি-২ বাজার, M.A.M.C. দুর্গাপুর - ১০
ফোন - ০৩৪৩-৫৫৬০১২৯
২) রাম নারায়ণ রাম ভবন, রেখা মিত্র, ৪৭ নতুন পল্লী, বর্ধমান
৩) জয়ন্ত দে, আহেরী টোলা ষ্ট্রীট, কোলকাতা-৫, ফোন - ২৫৩০-৪৮০৭
৪) সৌরীন্দ্র নাথ বাগচি, দক্ষিণেশ্বর, কোলকাতা - ৭৬, ফোন - ২৫৬৪-২৪৪১
৫) বিনয় মোদক, মধ্যমগ্রাম, কোল - ১৩০, ফোন - ২৫৩৭-১৫৯৩
৬) গৌর মুখার্জী, ১১/৫, পর্ণশ্রী, বেহালা, ফোন - ২৪৪৫-৯২২০
৭) ইতি বর্মন, দিনহাটা, কুচবিহার, মোঃ- ৯৯৩২৬৩৯৬৩৯
৮) কোলকাতা বইমেলা।
৯) তপন / অনিমা গাঙ্গুলী, মানকুন্ডু, হুগলী, ফোন - ২৬৮৫-৬১৪৬
১০) জলধর সাহা, সেক্রেটারী সন্তান দল, মেঘালয়, মোঃ- ৯৪৩৬১১২৬০১
১১) বলরাম, ৩৪ এস. কে. দেব রোড, কোল - ৭০০০৪৮
১২) Lakshindhar Das, Balasor, Orrisa, Phone : 92387-10622
১৩) বেদপ্রজ্ঞা মহিলা সংগঠন, লেকটাউন, কোলকাতা, ফোন - ২৫৩৪-৬১৩৬
১৪) সুভাষ ঘোষ, বিলাসীপাড়া, আসাম, ফোন - ০৩৬৬৭-২৫১১৭৯
১৫) বেদ অভেদ ধাম, হরে কৃষ্ণ, আলিপুরদুয়ার জং, মোঃ- ৯৪৩৪২০৪৫৯০
১৬) বাপি অধিকারী — কোটাল হাট বর্ধমান, ফোন - ৯২৩২৬৮৪২৫৯
১৭) উত্তম চ্যাটার্জী — নিয়ামতপুর, আসানসোল, ফোন - ০৩৪১-২৫১৫০৬৬
১৮) মধুসূদন মুখার্জী, পুরুলিয়া, ফোন - ০৯৯৩২৩৬৮৩৭৮
১৯) দেবু (নেতাজী দেবু) গড়িয়া, কোলকাতা, ফোন - ৯০০৭০৭৫১৯৯
২০) আইডিয়াল বুক হাউস, কলেজ স্কোয়ার, কোলকাতা - ৭০০০০৯
২১) তরুন/ইরা জোয়ারদার, বাবুপাড়া, জলপাইগুড়ি, ০৩৫৬১-২২৪৫১৯
২২) রমা নাথ মহন্ত, বালুরঘাট, দঃ দিনাজপুর, মোঃ- ০৯৭৩৩৩৩৯৪৩২
২৩) গনেশ রায়, ফালাকাটা, জলপাইগুড়ি, মোঃ- ৯৭৪৯০৯০১৮২
২৪) কালিপদ চক্রবর্ত্তী, পাখানজোড়, ছত্রিশগড়, মোঃ- ৯৪০৬০০১৫৭২
২৫) ভোলানাথ দাস, কালনা গেট, বর্ধমান, ফোন - ৯৪৭৪৬৯৫৬৫৪

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

-ঃ রাম নারায়ণ রাম ঃ-

অভিনব দর্শন প্রকাশনের প্রকাশিত পুস্তক সমূহ

পুস্তক পরিচিতি	*প্রকাশকাল*
১) বালক ব্রহ্মচারী ট্রাষ্টের নিবেদন	শুভ মহালয়া, ১৪১১
২) মৃত্যুর পর	শুভ মহালয়া, ১৪১১
৩) পরপারের কান্ডারী	শুভ বড়দিন, ১৪১১
৪) সাম্যের প্রতীক শিবশম্ভু	শুভ শিবরাত্রি, ১৪১১
৫) অঙ্গীকার	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১২
৬) ১৬ মাত্রায় নির্বিকল্প সমাধি	শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১২
৭) বীজ ও মহাসৃষ্টি	শুভ মহালয়া, ১৪১২
৮) শুভ উৎসব	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১২
৯) তত্ত্বসিন্ধু	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১২
১০) দেহী বিদেহী	শুভ নববর্ষ, ১৪১৩
১১) পথপ্রদর্শক	শুভ ১০ই আষাঢ়, ১৪১৩
১২) অমৃতের স্বাদ	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৩
১৩) বৈদিক বিপ্লব	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৩
১৪) সুরের সাগরে	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৪
১৫) পথের পাথেয়	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৪
১৬) জন্ম মৃত্যু রহস্য	শুভ মহালয়া, ১৪১৪
১৭) মহাশূন্য মহাচেতনার সাগর	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৪
১৮) আলোর বার্তা	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৪
১৯) কেন এই সৃষ্টি	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৫
২০) জন্মসিদ্ধ মহানের নির্দেশ	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৫
২১) তত্ত্বদর্শন	শুভ মহালয়া, ১৪১৫
২২) মহামন্ত্র মহানাম	শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৫
২৩) পাত্র ও মাত্রাজ্ঞান	শুভ মাঘী পূর্ণিমা, ১৪১৫
২৪) চেতনা ও মহাচৈতন্য	শুভ ১লা বৈশাখ, ১৪১৬
২৫) মনই সৃষ্টির উৎস	শুভ উপনয়ন দিবস, ১৪১৬
২৬) সাধু হও সাবধান	শুভ মহালয়া, ১৪১৬

'বেদপ্রজ্ঞা কমিউনিকেসন্' এর নিবেদন ঃ-

১) পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 1) শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৩
২) পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 2) শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৪
৩) পরমপিতা (ভিডিও সিডি, Vol. 3) শুভ দীপান্বিতা দিবস, ১৪১৫